# ভানুসিংহের পত্রাবলী

পত্রধারা—২

# ভানুসিংহের পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়

২১০ নং কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী-গ্রন্থন-বিভাগ
২১০ নং কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা।

# ভানুসিংহের পত্রাবলী

প্রথম সংস্করণ চৈত্র, ১৩৩৬ সাল।

মূল্য—এক টাকা

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, ( বীরভূম )।
রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# উৎসর্গ

এই পত্রগুলি দিয়ে যে পত্রপুট গাঁথা হ'য়েচে
তা'র মধ্যে রাণুর প্রতি ভানুদাদার
আশীর্ব্বাদ পূর্ণ রইলো।

# ভানুসিংহের পত্রাবলী

১

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠির জবাব দেবো ব'লে চিঠিখানি যত্নসহকারে রেখেছিলুম, কিন্তু কোথায় রেখেছিলুম সে কথা ভুলে যাওয়াতে এতদিন দেরি হ'য়ে গেল। আজ হঠাৎ খুঁজ্‌তেই ডেস্কের ভিতর হ'তে আপনিই বেরিয়ে পড়্‌লো।

কবি-শেখরের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেচো। রাজকন্যার সঙ্গে নিশ্চয় তার বিয়ে হ'তো, কিন্তু তা'র পূর্ব্বেই সে ম'রে গিয়েছিলো। মরাটা তার অত্যন্ত ভুল হয়েছিলো, কিন্তু সে আর এখন শোধরাবার উপায়

নেই। যে-খরচে রাজা তার বিয়ে দিত সেই খরচে খুব ধুম ক'রে তার অন্ত্যেষ্টি সৎকার হয়েছিলো।

ক্ষুধিত পাষাণে ইরাণী বাঁদির কথা জান্‌বার জন্যে আমারও খুব ইচ্ছে আছে কিন্তু যে-লোকটা বল্‌তে পারতো আজ পর্য্যন্ত তা'র ঠিকানা পাওয়া গেল না।

তোমার নিমন্ত্রণ আমি ভুল্‌ব না—হয়তো তোমাদের বাড়িতে একদিন যাবো, কিন্তু তা'র আগে তুমি যদি আর-কোনো বাড়িতে চলে যাও? সংসারে এই রকম ক'রেই গল্প ঠিক জায়গায় সম্পূর্ণ হয় না।

এই দেখো না কেন, খুব শীঘ্রই তোমার চিঠির জবাব দেবো ব'লে ইচ্ছা ক'রেছিলুম, কিন্তু এমন হ'তে পার্‌তো তোমার চিঠি আমার ডেস্কের কোণেই লুকিয়ে থাক্‌তো, এবং কোনোদিনই তোমার ঠিকানা খুঁজে পেতুম না।

যেদিন বড়ো হ'য়ে তুমি আমার সব বই প'ড়ে বুঝ্‌তে পার্‌বে তা'র আগেই তোমার নিমন্ত্রণ সেরে আস্‌তে চাই। কেননা যখন সব বুঝ্‌বে তখন হয়তো সব ভালো লাগ্‌বে না—তখন যে-ঘরে তোমার ভাঙা পুতুল থাকে সেই ঘরে রবিবাবুকে স্থান দেবে।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি—৩রা ভাদ্র ১৩২৪।

২

কলিকাতা

আমার একদিন ছিল যখন আমি ছোটো ছিলুম—তখন আমি ঘন ঘন এবং বড়ো বড়ো চিঠি লিখ্‌তুম। তুমি যদি তা'র আগে জন্মাতে, যদি অনর্থক এত দেরি না ক'র্‌তে, তাহ'লে আমার চিঠির উত্তরের জন্য একদিনও সবুর ক'র্‌তে হ'তো না। আজ আর চিঠি লেখ্‌বার সময় পাই নে। তোমার বয়স আমার যখন ছিল তখন নিজের ইচ্ছেয় চিঠি লিখ্‌তুম, এখন অন্যের ইচ্ছেয় এত বেশি লিখ্‌তে হয় যে, নিজের ইচ্ছেটা মারাই গেল! তারপরে আবার ভয়ানক কুঁড়ে হ'য়ে গেছি। যত বেশি কাজ করতে হচ্চে ততই কুঁড়েমি আরো বেড়ে যাচ্চে। এখন লিখে যাওয়ার চেয়ে ব'কে যাওয়া ঢের বেশি সহজ মনে হয়। যদি তেমন স্থবিধে হ'তো তো দেখিয়ে দিতুম বকুনিতে তুমি কখনো আমার সঙ্গে পেরে উঠ্‌তে না। সেটা তোমার ভালো লাগ্‌তো কিনা বল্‌তে পারিনে। কেননা তোমার যতগুলি পুতুল আছে তা'রা কেউ তোমার কথার জবাব করে না। তুমি যা বলো তাই তা'রা চুপ ক'রে শুনে

যায়। আমার দ্বারা কিন্তু সেটা হবার জো নেই—অন্যের কথা শোনার চেয়ে অন্যকে কথা শোনানো আমার অভ্যেস হ'য়ে গেছে। আমার বড়ো মেয়ে যখন ছোটো ছিল তখন বকুনিতে তা'র সঙ্গে পারতুম না, কিন্তু এখন সে বড়ো হ'য়ে শ্বশুরবাড়ি চ'লে গেছে। তারপর থেকে আমার সমকক্ষ কাউকে পাইনি। তোমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে আমার খুব ইচ্ছে রইলো। একদিন হয়তো তোমাদের সহরে যাবো। তুমি লিখেচো আমাকে গাড়িতে ক'রে নিয়ে যাবে। কিন্তু আগে থাক্‌তে ব'লে রাখি আমাকে দেখ্‌তে নারদমুনির মতো—মস্ত বড়ো পাকা দাড়ি। ভয় ক'রো না, আমি তা'র মতোই ঝগড়াটেও বটে, কিন্তু ছোটো মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করা আমার স্বভাব নয়। তোমার কাছে খুব ভালো মানুষটির মতো থাক্‌বার আমি খুব চেষ্টা কর্‌বো—এমন কি কবিশেখরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়েতে যদি তোমার মত থাকে আমি স্বয়ং তা'র ঘটকালি ক'রে দিতে রাজি আছি। ইতি—২১শে ভাদ্র, ১৩২৪।

৬

কলিকাতা

তোমার সঙ্গে চিঠি লিখে জিততে পারবো না এ আমি আগে থাক্‌তে ব'লে রাখ্‌চি। তোমার মতো বাসন্তী রঙের কাগজ আমি খুঁজে পেলুম না। সামান্য শাদা কাগজই সব সময়ে খুঁজে পাইনে। তোমাকে তো আগেই ব'লেচি, আমি কুঁড়ে। তারপরে, আমি ভারি এলোমেলো,—কোথায় কী রাখি তা'র কোনো ঠিকানা পাইনে। এমন আমার আরো অনেক দোষ আছে। এই তো চিঠির কাগজের কথা। তারপরে ভেবেছিলুম ছবি এঁকে তোমার সচিত্র চিঠির উপযুক্ত জবাব দেবো—চেষ্টা ক'র্‌তে গিয়ে দেখ্‌লুম অহঙ্কার বজায় থাক্‌বে না। এ বয়সে নতুন ক'রে হাঁস আঁক্‌তে বসা আমার পক্ষে চ'ল্‌বে না। গ—অক্ষরের পেটের নীচে খণ্ড ত জুড়েও সুবিধে ক'র্‌তে পার্‌লুম না—সেটা এই রকম বিশ্রী দেখতে হ'লো। অনেক সময় পদ্মার চরে কাটিয়েচি; সেখানে হাঁসের দল ছাড়া আমার আর সঙ্গী ছিল না। তাদের প্রতি আমার মনের কৃতজ্ঞতা থাকাতেই আমাকে আজ থেমে যেতে হ'লো—এবার-

কার মতো তোমার হাঁসেরই জিৎ রইলো। এই তো গেল ছবি, তারপরে সময়। তাতেও তোমার সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। তাই ভয় হ'চ্চে শেষকালে তুমি রাগ ক'রে আর-কোনো গল্প-লিখিয়ে গ্রন্থকারের সঙ্গে ভাব ক'র্‌বে—কিন্তু নিমন্ত্রণ আমার পাকা রইলো।

কলিকাতা

তুমি দেরি ক'রে আমার চিঠির উত্তর দিয়েছিলে এতে আমার রাগ করাই উচিত ছিল, কিন্তু রাগ ক'র্‌তে সাহস হয় না—কেননা আমার স্বভাবে অনেক দোষ আছে—দেরি ক'রে উত্তর দেওয়া তা'র মধ্যে একটি। আমি জানি তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি অনেক সহ্য ক'র্‌তে পারো; আমার কুঁড়েমি, আমার ভোলা-স্বভাব, আমার এই সাতান্ন বছর বয়সের যত রকম শৈথিল্য সব তোমাকে সহ্য ক'র্‌তে হবে। আমার মতো অন্যমনস্ক অকেজো মানুষের সঙ্গে ভাব রাখ্‌তে হ'লে খুব সহিষ্ণুতা থাকা চাই—চিঠির উত্তর যত পাবে তার চেয়ে বেশি চিঠি লেখবার মতো শক্তি যদি তোমার না থাকে,

দেনাপাওনা সম্বন্ধে তোমার হিসাব যদি খুব বেশি কড়াক্কড় হয় তাহ'লে একদিন আমার সঙ্গে হয়তো ঝগড়া হ'তেও পারে, এই কথা মনে ক'রে ভয়ে ভয়ে আছি। কিন্তু এ কথা আমি জোর ক'রে ব'ল্‌চি যে, ঝগড়া যদি কোনো দিন বাধে তা'র অপরাধটা আমার দিকে ঘটতে পারে, কিন্তু রাগটা তোমার দিকেই হবে। আর যা'হোক্ আমি রাগী নই। তার কারণ এ নয় যে, আমি খুব ভালোমানুষ, তার কারণ এই যে, আমার স্মরণশক্তি ভারি কম। রাগ কর্‌বার কারণ কী ঘটেচে সে আমি কিছুতেই মনে রাখ্‌তে পারিনে। তুমি মনে ক'রো না কেবল পরের সম্বন্ধেই আমার এই দশা, নিজের দোষের কথা আমি আরো বেশি ভুলি। চিঠির জবাব দিতে যখন ভুলে যাই তখন মনেও থাকে না যে ভুলে গেছি; কর্ত্তব্য ক'র্‌তে ভুলি, ভুল সংশোধন ক'র্‌তেও ভুলি, সংশোধন ক'র্‌তে ভুলেচি তাও ভুলি। এমন অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব করো এবং সে বন্ধুত্ব যদি স্থায়ী রাখ্‌তে চাও তাহ'লে তোমাকেও অনেক ভুল্‌তে হবে, বিশেষত চিঠির হিসাবটা।

পদ্মার ধারের হাঁসেদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হ'লো কী ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রেচো। বোধ হয় তা'র কারণ

এই যে, বোবার শত্রু নেই। ওরা যখন খুব দল বেঁধে চেঁচামেচি করে আমি চুপ ক'রে শুনি, একটিও জবাব দিইনে। আমি এত বেশি শান্ত হ'য়ে থাকি যে, ওরা আমাকে মানুষ ব'লেই গণ্যই করে না—আমাকে বোধ হয় পাখীর অধম ব'লেই জানে—কেননা আমার দুই পা আছে বটে কিন্তু ডানা নেই। আর যাই হোক্ ওদের সঙ্গে আমার চিঠিপত্র চলে না—যদি চ'ল্‌তো তাহ'লে আমাকেই হার মান্‌তে হ'তো—কেননা ওদের ডানা-ভরা কলম আছে, আর ওদের সময়ের টানাটানি খুব কম।

তোমাকে-যে এত বড়ো চিঠি লিখ্‌লুম আমার ভয় হ'চ্চে পাছে বিশ্বাস না করো যে আমার সময় কম। অনেক কাজ প'ড়ে আছে—কাজ ফাঁকি দিয়েই তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি—কাজ যদি না থাক্‌তো তাহ'লে কাজ ফাঁকি দেওয়াও চল্‌তো না।

বেলা অনেক হ'য়ে গেছে—অনেক আগে স্নান ক'র্‌তে যাওয়া উচিত ছিল—হাঁসেদের কথায় হঠাৎ স্নানের কথাটা মনে প'ড়ে গেল—তা'হ'লে আজ চল্লুম। আজ রাত্রে বোলপুর যেতে হবে। ইতি—

৬ই কার্ত্তিক, ১৩২৪।

৫

শান্তিনিকেতন

তোমাদের বইয়ে বোধ হয় প'ড়ে থাক্‌বে, পাখীরা মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ওপারে চ'লে যায়। আমি হচ্চি সেই-জাতের পাখী। মাঝে মাঝে দূর পার থেকে ডাক আসে, আমার পাখা ধড়ফড় ক'রে ওঠে। আমি এই বৈশাখ মাসের শেষ দিকে জাহাজে চ'ড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেবো ব'লে আয়োজন ক'র্‌চি। যদি কোনো বাধা না ঘটে তাহ'লে বেরিয়ে প'ড়্‌বো। পশ্চিম দিকের সমুদ্র-পথ আজকাল যুদ্ধের দিনে সকল সময়ে পারের দিকে পৌঁছিয়ে দেয় না, তলার দিকেই টানে। পূর্ব্ব দিকের সমুদ্রপথ এখনো খোলা আছে—কোন্‌দিন হয়তো দেখ্‌ব সেখানেও যুদ্ধের ঝড় এসে পৌঁছেচে। যাই হোক্‌ তোমার কাশীর নিমন্ত্রণ-যে ভুলেচি তা মনে ক'রো না; তুমি আয়োজন ঠিক ক'রে রেখো, আমি কেবল একবার পথের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দুটো চারটে জায়গায় নিমন্ত্রণ চট্‌ ক'রে সেরে নিয়ে তারপরে তোমার ওখানে গিয়ে বেশ আরাম ক'রে ব'স্‌বো—আমার জন্যে

কিন্তু ছাতু কিম্বা রুটি, অড়রের ডাল এবং চাটনির বন্দোবস্ত ক'র্‌লে চল্‌বে না; তোমাদের মহারাজ নিশ্চয়ই খুব ভাল রাঁধে, কিন্তু তুমি যদি নিজে স্বহস্তে শুক্‌তানি থেকে আরম্ভ ক'রে পায়স পর্য্যন্ত রেঁধে না খাওয়াও তাহ'লে সেই মুহূর্ত্তেই আমি—কী ক'র্‌বো এখনো তা ঠিক করিনি—ভাব্‌ছিলুম না খেয়েই সেই মুহূর্ত্তেই আবার অষ্ট্রেলিয়া চ'লে যাবো—কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পার্‌বো কিনা একটু সন্দেহ আছে সেইজন্যেই এখন কিছু বল্লুম না। কিন্তু রান্না অভ্যাস হয়নি বুঝি? তাই বলো। কেবলি পড়া মুখস্থ ক'রেচো? আচ্ছা, অন্ততঃ এক বছর সময় দিলুম—এর মধ্যেই মার কাছে শিখে নিয়ো। তাহ'লে সেই কথা রইলো, আপাতত আমাকে ক'ল্‌কাতায় যেতে হবে, বাক্সগুলো গুছিয়ে ফেলা চাই। আমি খুব ভালো গোছাতে পারি। কেবল আমার একটু যৎসামান্য দোষ আছে—প্রধান-প্রধান দরকারী জিনিষগুলো প্যাক ক'র্‌তে প্রায়ই ভুলে যাই—যখন তাদের দরকার হয় ঠিক সেই সময় দেখি তাদের আনা হয়নি। এতে বিষম অসুবিধা হয় বটে কিন্তু গোছাবার ভারি সুবিধে—কেননা বাক্সের মধ্যে যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায়, আর বোঝা কম হওয়াতে

রেলভাড়া জাহাজভাড়া অনেক কম লাগে। দরকারী জিনিষ না নিয়ে অদরকারী জিনিষ সঙ্গে নেবার আর-একটা মস্ত সুবিধে হচ্চে এই যে—সেগুলো বারবার বের-করাকরির দরকার হয় না, বেশ গোছানোই থেকে যায়; আর যদি হারিয়ে যায় কিম্বা চুরি যায় তাহ'লেও কাজের বিশেষ ব্যাঘাত কিম্বা মনের অশান্তি ঘটে না। আজ আর বেশি লেখ্‌বার সময় নেই, কেননা আজ তিনটের গাড়িতেই রওনা হ'তে হবে। গাড়ি ফেল কর্‌বার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু সে ক্ষমতাটা আজকে আমার পক্ষে সুবিধার হবে না; অতএব তোমাকে নববর্ষের আশীর্ব্বাদ জানিয়ে আমি টিকিট কিনতে দৌড়লুম। ইতি—২রা বৈশাখ, ১৩২৫।

৬

শান্তিনিকেতন

কাল সন্ধ্যাবেলায় স্তরে স্তরে গাঢ় নীল মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল—তখন নীচের সেই পূর্বদিকের বারান্দায় সাহেবে আমাতে মিলে খাচ্ছিলুম—আমার আর-সব খাওয়া হ'য়ে গিয়ে যখন চিঁড়েভাজা খেতে

আরম্ভ ক'রেচি এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে সোঁ সোঁ ক'রে হাওয়া এসে সমস্ত কালো মেঘ আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বিছিয়ে দিলে। কতদিন পরে ঐ সজল মেঘ দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। যদি আমি তোমাদের কাশীর হিন্দুস্থানী মেয়ে হ'তুম তাহ'লে কাজ্‌রী গাইতে গাইতে শিরীষ-গাছের দোলাটাতে দুল্‌তে যেতুম। কিন্তু এণ্ড্রুজ্‌ কিম্বা আমি, আমাদের দু-জনের কারো হিন্দুস্থানী মেয়ের মতো আকৃতি প্রকৃতি কিম্বা চালচলন নয়, তা ছাড়া সে কাজ্‌রী গান জানে না, আমিও যা জানতুম ভুলে গেচি। তাই দু-জনে মিলে উপরে আমার ছাদের সাম্‌নেকার বারান্দায় এসে ব'স্‌লুম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘনবৃষ্টি নেমে এলো—জলে বাতাসে মিলে আকাশময় তোলপাড় ক'রে বেড়াতে লাগ্‌লো। আমার ছাদের সাম্‌নেকার পেঁপে গাছটার লম্বা পাতাগুলোকে ধ'রে ঠিক যেন কানমলা দিতে লাগ্‌লো। শেষকালে বৃষ্টি প্রবল হ'য়ে গায়ে যখন ছাঁট লাগ্‌তে আরম্ভ হ'লো, তখন আমার সেই কোণটাতে এসে আশ্রয় নিলুম। এমন সময় চোখ ধাঁদিয়ে কড়কড় শব্দে প্রকাণ্ড একটা বাজ প'ড়লো। আমাদের মনে

হ'লো বাগানের মধ্যেই কোথাও পড়েচে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে দেখি হরিচরণ পণ্ডিতের বাসার দিকে ছেলেরা ছুট্‌চে। সেই বাড়িতেই বাজ প'ড়েছিলো। তখন তাঁর বড়ো মেয়ে উনানে দুধ জ্বাল দিচ্ছিলেন, তিনি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়লেন। ছেলেরা দূর থেকে দেখ্‌তে পেলে চালের উপর থেকে ধোঁয়া উঠ্‌তে আরম্ভ হ'য়েচে। তা'রা তো সব চালের উপর চ'ড়ে 'জল জল' ক'রে চীৎকার ক'র্‌তে লাগ্‌লো। ছেলেরা কুয়ো থেকে জল ভ'রে এনে চালের উপর আগুন নিবিয়ে ফেল্লে। ভাগ্যে, হরিচরণের বাড়ির কাউকে আঘাত লাগে নি। কেবল হরিচরণের মেয়ের হাত একটু পুড়ে ফোস্‌কা প'ড়ছিলো। কিন্তু সব চেয়ে ভালো লেগেছিলো আমার ছেলেদের উদ্যোগ দেখে। তাদের না আছে ভয়, না আছে ক্লান্তি। নির্ভয়ে হাতে ক'রে ক'রে চালের খড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতে লাগ্‌লো। আর দূরের কুয়ো থেকে দৌড়ে দৌড়ে সার বেঁধে জলভরা ঘড়া এনে উপস্থিত ক'র্‌তে লাগলো। ওরা যদি না দেখ্‌তো এবং না এসে জুট্‌তো তাহ'লে মস্ত একটা অগ্নিকাণ্ড হ'তো। এমনি ক'রে কাল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঝড়-বাদল হ'য়ে আজ অনেকটা ঠাণ্ডা

আছে। আকাশ এখনো মেঘে লেপে আছে, হয়তো আজও বিকেলে একচোট বৃষ্টি সুরু হবে! ইতি—৫ই শ্রাবণ, ১৩২৫।

৭

শান্তিনিকেতন

তুমি আজকাল খুব পড়ায় লেগে গেছো, কিন্তু আমি-যে চুপচাপ ক'রে ব'সে থাকি তা মনে ক'রো না। আমার কাজ চ'ল্‌চে। সকালে তুমি তো জানো সেই আমার তিন ক্লাশের পড়ানো আছে। তা'রপরে স্নান ক'রে খেয়ে, যেদিন চিঠি লেখ্‌বার থাকে চিঠি লিখি। তারপরে বিকেলে খাবার খবর দেবার আগে পর্য্যন্ত ছেলেদের যা পড়াতে হয় তাই তৈরি ক'রে রাখি। তারপরে সন্ধ্যার সময় ছাতে চুপচাপ ব'সে থাকি—কিন্তু এক-একদিন ছেলেরা আমার কাছে কবিতা শুন্‌তে আসে। তা'রপরে অন্ধকার হ'য়ে আসে—তারাগুলিতে আকাশ ছেয়ে যায়—দিনুর ঘর থেকে ছেলেদের গলা শুন্‌তে পাই—তা'রা গান শেখে—তা'রপরে গান বন্ধ হ'য়ে যায়। তখন

আদ্যবিভাগের ছেলেদের ঘর থেকে হারমোনিয়ম্ এবং বাঁশির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গানের ধ্বনি উঠ্‌তে থাকে। ক্রমে রাত্রি আরো গভীর হয়, তখন ছেলেদের ঘরের গানও বন্ধ হ'য়ে যায়, আর দূরে গ্রামের রাস্তার ভিতর দিয়ে দুই একটা আলো চ'ল্‌চে দেখ্‌তে পাই। তা'র-পরে সে আলোও থাকে না, কেবলমাত্র আকাশজোড়া তারার আলো। তা'রপরে ব'সে থাক্‌তে থাক্‌তে ঘুম পেয়ে আসে, তখন আস্তে আস্তে উঠে শুতে যাই। তা'রপরে কখন এক সময়ে আমার পূর্ব্বদিকের দরজার সম্মুখে আকাশের অন্ধকার অল্প অল্প ফিকে হ'য়ে আসে, দুটো একটা শালিকপাখী উস্‌খুস্ ক'রে ওঠে, মেঘের গায়ে গায়ে সোনালি আভা ফোটে, খানিক বাদেই সাড়ে চারটার সময় আদ্যবিভাগে ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজ্‌তে থাকে, অমনি আমি উঠে পড়ি। মুখ ধুয়ে এসে আমার সেই পূর্ব্বদিকের বারান্দায় পাথরের চৌকির উপর আসন পেতে উপাসনায় বসি। সূর্য্য ধীরে ধীরে উঠে তা'র আলোকের স্পর্শে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে। আজকাল সকাল সকাল খেতে যেতে হয়, কেননা সাড়ে ছটার সময় আশ্রমের সকল বালকবৃদ্ধ আমরা বিদ্যালয়ের সাম্‌নের মাঠে একত্র হই,

একটি কোনো গান হ'য়ে তা'র পরে আমাদের স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়। ঠিক প্রথম ঘণ্টায় আমার ক্লাশ নেই। কিন্তু সেই সময়ে আমি আমার কোণটাতে এসে একবার আমার পড়াবার বই ও খাতাপত্র দেখে শুনে ঠিক ক'রে নিই—তা'রপরে আমার কাজ। এই আমার দিনরাতের হিসাব তোমার কাছে দিলুম। কেমন শান্তিতে দিন চ'লে যায়! ঐ ছেলেদের কাজ ক'র্‌তে আমার খুব ভালো লাগে। কেননা ওরা জানে না যে, আমরা ওদের জন্য যে-কাজ করি তা'র কোনো মূল্য আছে। ওরা যেমন অনায়াসে সূর্য্যের কাছ থেকে তা'র আলো নেয় আমাদের হাত থেকে তেমনি অনায়াসে সেবা নেয়। হাটে দোকানদারদের কাছ থেকে যেমন দরদস্তুর ক'রে জিনিষ কিন্‌তে হয় তেমন ক'রে নয়। এরা যখন বড়ো হবে, যখন সংসারের কাজে প্রবেশ ক'র্‌বে, তখন হয়তো মনে প'ড়বে—এই আশ্রমের প্রান্তর, এখানকার শালের বীথিকা, এখানকার আকাশের উদার আলো এবং উন্মুক্ত সমীরণ এবং প্রতিদিন সকালে বিকালে এখানে আকাশতলে নীরবে ব'সে ঠাকুরকে প্রণাম। ইতি—

১২ই শ্রাবণ, ১৩২৫।

৮

শান্তিনিকেতন

দিনগুলো আজকাল শরৎকালের মতো সুন্দর হ'য়ে উঠেচে। আকাশে ছিন্ন মেঘগুলো উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। আমলকীগাছের পাতাগুলিকে ঝর্‌ঝরিয়ে দিয়ে বাতাস ব'য়ে যাচ্চে, তা'র মধ্যে একটা আলস্যের সুর বাজ্‌চে, আর বৃষ্টিতে-ধোওয়া রোদ্দুরটি যেন সরস্বতীর বীণার তারগুলো থেকে বেজে-ওঠা গানের মতো সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেচে। আমার ঠিক চোখের উপরেই সন্তোষবাবুর বাড়ির সাম্‌নেকার সবুজ ক্ষেত রৌদ্রে ঝল্‌মল্ ক'রে উঠেচে; আর তা'রই একপাশ দিয়ে বোলপুর যাবার রাঙা রাস্তাটা চ'লে গেচে—ঠিক যেন একটি সোনালী সবুজ সাড়ির রাঙা পাড়ের মতো। খুব ছেলেবেলা থেকেই এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার গলাগলি ভাব—তাই আমার জীবনের কত কালই নদীর নির্জ্জন চরে কাটিয়েচি। তা'রপরে কতদিন গেচে এখানকার নির্জ্জন প্রান্তরে। তখন এখানে বিদ্যালয় ছিল না, তখন শান্তিনিকেতনের বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় ব'সে

খুব বৃহৎ একটি নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে যেতে পারতুম; —রাত্রে ঐ বারান্দায় যখন শুয়ে থাক্‌তুম তখন আকাশের সমস্ত তারা যেন আমার পাড়াপড়শির মতো তাদের জান্‌লা থেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে কী ব'ল্‌তো, তাদের কথা শোনা যেতো না, কিন্তু তাদের মুখ-চোখের হাসি আমাকে এসে স্পর্শ ক'রতো। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ভাব করার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, সে আনন্দ দেয়, কিন্তু কিছু দাবী করে না; সে তা'র বন্ধুত্বকে ফাঁসের মতো বেঁধে ফেল্‌তে চেষ্টা করে না, সে মানুষকে মুক্তি দেয়, তাকে দখল ক'রে নিতে চায় না। ১৮ই শ্রাবণ, ১৩২৫।

৯

শান্তিনিকেতন

আজ সকাল থেকে ঘন ঘোর মেঘ ক'রে প্রবল বেগে বর্ষণ চল্‌চে, সকালে কোনো মাষ্টার তাই ক্লাশ নেন্‌নি। কিন্তু থার্ড ক্লাশের ছেলেদের আমি ছুটি দিতে পার্‌লুম না—তাদের পড়া খুব শক্ত, মাঝে মাঝে ফাঁক প'ড়্‌লে সমস্ত আল্‌গা হ'য়ে যাবে, তাই সেই

বৃষ্টির মধ্যেও তাদের সংগ্রহ ক'রে আনা গেল। পড়াতে পড়াতে বৃষ্টির বেগ বেড়ে উঠ্‌লো, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। আমার শোবার ঘরে ক্লাশ হয়—ঘরে ছাঁট আস্‌তে লাগ্‌লো। সার্সি বন্ধ ক'রে দিলুম—পাঠ্য শেষ হ'য়ে গেল, কিন্তু বৃষ্টি শেষ হয় না—এই বৃষ্টিতে তাদের তো ছেড়ে দিতে পারিনে। শেষকালে ওরা আমাকে ধ'রে প'ড়্‌লো, মুখে মুখে একটা গল্প বানিয়ে ওদের শোনাতে। কিন্তু ভেবে দেখো আমার বয়স এখন সাতান্ন বছর হ'য়েচে, এখন কি ইচ্ছা ক'রলেই অনর্গল গল্প ব'ল্‌তে পারি? শেষকালে আমি কর্‌লুম কী, একটা গল্পের কেবল গোড়া ধরিয়ে দিয়ে ওদের বল্লুম সেইটে এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ ক'রে লিখে আনতে। ওরা তো উৎসাহের সঙ্গে রাজী হ'লো, কিন্তু ওদের গল্প যে কী রকম হবে তা কল্পনা ক'রে আমার মনে কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ হ'চ্চে না। যাক্‌গে, ওরা তো সেই গল্প মাথায় নিয়ে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে চেঁচাতে চেঁচাতে ওদের ঘরে চ'লে গেল—আমি গেলুম স্নান ক'র্‌তে। স্নান ক'রে খেয়ে এসে আজ তাকিয়ায় একটু হেলান দিয়ে প'ড়েছিলুম। কিন্তু সমস্ত দিন তো কুঁড়েমি ক'রে কাটাতে পারিনে। অন্য দিন হ'লে উঠে আমার

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ক্লাশের জন্য পড়ার বই লিখ্‌তে ব'স্‌তুম, কিন্তু আজ বাদ্‌লার দিনে সেটা ভালো লাগ্‌লো না, তাই "বিদায়-অভিশাপ"টা ইংরেজিতে তর্জ্জমা ক'র্‌তে ব'সে গিয়েছিলুম। বেশ ভালোই লাগ্‌ছিলো ; পাতা দুয়েক যখন শেষ হ'য়ে গেচে, এমন সময় চিঠি হাতে ক'রে এক হরকরার প্রবেশ। কাজেই এখন কিছুক্ষণের জন্য দেবযানীকে অপেক্ষা ক'র্‌তে হ'চ্চে। বৃষ্টি থেমে গেচে কিন্তু জলভারাবনত মেঘে আকাশ ভরা। এতদিন শ্রাবণের দেখা ছিল না, যেই বিশে একুশে হ'য়েচে অম্‌নি যেন কোনোমতে ছুট্‌তে ছুট্‌তে শেষ ট্রেণটা ধ'রে হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। কম হাঁপাচ্চে না,—তা'র হাঁপানির বেগে আমাদের শালবন বিচলিত, আম্‌লকিবন কম্পান্বিত, তালবন মর্ম্মরিত, বাঁধের জল কল্লোলিত, কচি ধানের ক্ষেত হিল্লোলিত, আর আমার এই জান্‌লার খড়খড়িগুলো ক্ষণে ক্ষণে খড়খড়ায়িত। ইতি—২১শে শ্রাবণ, ১৩২৫।

১০

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠি আজ এইমাত্র পেলুম। এইমাত্র ব'ল্‌তে কী বোঝায় বলি। দুপুর বেলাকার খাওয়া হ'য়ে গেচে। সেই কোণটাতে তাকিয়া ঠেশান দিয়ে ব'সেছিলুম। আকাশ ঘন মেঘে অন্ধকার হ'য়ে গেচে —পশ্চিম দিক থেকে মাঝে মাঝে সোঁ সোঁ ক'রে ঝোড়ো বাতাস বইচে। ইন্দ্রের ঐরাবতের বাচ্চাগুলোর মতো মোটা মোটা কালো মেঘ আকাশময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। মাঝে মাঝে গুরু গুরু গর্জ্জন শোনা যায়। সাম্‌নে সবুজ মাঠের উপরে মেঘ্‌লা দিনের ছায়া, নিবিড় স্নিগ্ধতার মধ্যে চোখ ডুবে গেচে। তোমাকে লিখ্‌তে লিখ্‌তে বৃষ্টি নেমে এলো—বৃষ্টি একটুমাত্র দেখা দিলেই আমার এই বারান্দায় তা'র পায়ের শব্দ তখনি শোনা যায়। দূরে ভুবনডাঙার দিকে বাঁধের কাছে যে ঘন বনশ্রেণী দেখা যায়, বৃষ্টির ধারায় সেটা একটু ঝাপ্‌সা হ'য়ে এসেচে—বনলক্ষ্মী যেন তা'র পাত্‌লা ওড়্‌নাটাকে মুখের উপর ঘোম্‌টা টেনে দিয়েচে। ক-টা বেজেচে, ঠিক ব'ল্‌তে পারিনে। আমার সামনের দেয়ালে যে-

ঘড়িটা ছিল তাকে নির্ব্বাসিত ক'রে দিয়েচি। ইদানীং তা'র ব্যবহারে এমন হ'য়ে এসেছিল-যে, তাকে বিশ্বাস করবার জো ছিল না—সে চ'ল্‌তোও ভুল ব'ল্‌তোও ভুল, তা'র পরামর্শমতো খেতে শুতে গিয়ে আমি অনেকবার ঠ'কেচি। তবু উপযুক্ত উপায়ে তাকে-যে সংশোধন করা যেতো না তা ব'লতে পারিনে—কিন্তু সময়ের জন্যই ঘড়ি, ঘড়ির জন্য সময় নষ্ট করা আমার পোষায় না। যাই হোক আন্দাজে মনে হ'চ্চে একটা দেড়টা হ'য়ে গেচে। আর একটু বাদেই আমাকে একটা ক্লাশ পড়াতে হবে। আজকাল প্রায় জন পনেরো গুজ্‌রাটি ছেলে এসেচে, কী ক'রে তাদের বাংলা পড়াতে হবে সেইটে আজ আমি দেখিয়ে দেবো—বৌমা আর শৈল ওদের দুপুর বেলায় একঘণ্টা ক'রে বাংলা পড়াতে রাজি হয়েচেন।

ইতিমধ্যে এণ্ড্রুজ্‌ সাহেবের খুব অসুখ ক'রেছিলো। আমাদের ভাবনা হ'য়েছিলো। একদিন তো রাত্রে তাঁর নিজের মনে হ'লো তাঁর ওলাউঠা হ'য়েচে। সেই রাত্রি এক্‌টার সময় বর্দ্ধমানে ডাক্তার ডাক্‌তে লোক পাঠিয়ে দিলুম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ওষুধ খেয়ে এতটা ভালো হ'য়ে উঠ্‌লেন-যে, ভোরের বেলায় আবার

টেলিগ্রাফ ক'রে ডাক্তার আনা বন্ধ ক'রে দিলুম। তুমি তো জানোই আমার হাতের রেখায় লেখা আছে—আমি ডাক্তারি ক'র্তে পারি। যাই হোক্, এখন সাহেব আবার সেরে উঠে পূর্ব্বের মতোই চারিদিকে দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্চেন। কিন্তু তিনি সেই-যে জাপানি ঝোলা কাপড়টা প'রতেন সেটা আজকাল আর দেখ্তে পাইনে।

বৃষ্টি একটুখানি হ'য়েই থেমে গেল। বাতাসটাও বন্ধ হ'য়েচে। কিন্তু পূবের দিকে খুব একটা ঘন নীল মেঘ ভ্রূকুটি ক'রে থ'ম্‌কে দাঁড়িয়ে র'য়েচে—এখনি বোধ হয় বরুণ-বাণ বর্ষণ ক'র্তে লেগে যাবে। আমরা আশ্রমে অনেক নতুন গাছ লাগিয়েচি, ভালো ক'রে বৃষ্টি হ'লে ভালোই হয়। কিন্তু আজকাল শরৎকালের মতো হ'য়েচে—রৌদ্রে বৃষ্টিতে মিলে ক্ষণে ক্ষণে খেলা স্থুরু হ'য়ে গেচে। তোমরা গান-বাজ্না শিখ্তে স্থুরু ক'রেচো শুনে খুব স্থখী হলুম। আজ আমার আর সময়ও নেই, কাগজও ফুরোলো, পাড়া জুড়োলো, বগি এলো ক্লাসে।

১১

শান্তিনিকেতন

আজ বুধবার। কদিন খুব বৃষ্টি-বাদলের পর আজ সকালের আকাশে সূর্য্যের আলো নির্ম্মল হ'য়ে ফুটে উঠেচে। শিশু যেমন দোলায় শুয়ে শুয়ে অকারণ আনন্দে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎ হ'য়ে শুয়ে কলহাস্য ক'র্‌তে থাকে, তেমনি ক'রে আশ্রমের গাছপালাগুলি আজ তাদের ডালপালা দুলিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবলি ঝিল্‌মিল্ ক'রে উঠ্‌চে। এখন সকাল বেলা—স্নিগ্ধ বাতাস বইচে, পাখীর ডাকে এখানকার শালবন এবং আমবাগান মুখরিত। আমাদের মন্দিরের উপাসনা হ'য়ে গেচে। তারপরে এতক্ষণ আমার জান্‌লার ধারের সেই কোণ্‌টিতে শুয়েছিলুম। প্রতি বুধবারে উপাসনার পরে এণ্ড্রুজ্ একবার এসে, আমি কী ব'লেচি, আমার কাছে ইংরেজিতে তাই বুঝিয়ে নেন। বুঝিয়ে নিয়ে খুসী হ'য়ে তিনি চ'লে গেচেন। আমি কী বলেছিলুম জানো? এই সৃষ্টির দিকে প্রথম তাকালে কী দেখ্‌তে পাই? এর আগা-গোড়া সমস্ত নিয়মে বাঁধা, এর সমস্ত অণুপরমাণুর

মধ্যে নিয়মের ফাঁক এতটুকুও নেই। কেমন জানো? যেমন একটি সহস্র-তারবাঁধা বীণাযন্ত্র। এই বীণার প্রত্যেক তারটি খুব খাঁটি হিসাব ক'রে বাঁধা, অর্থাৎ এই বীণাটির তুম্বা থেকে আরম্ভ ক'রে এর সূক্ষ্মতম তারটি পর্য্যন্ত সমস্তই সত্য। কিন্তু না-হয় সত্যই হ'লো, তাতে আমার কী! বীণার তার বাঁধার খাঁটি নিয়ম নিয়ে আমি কী ক'র্‌বো? তেমনি এই জগতে সূর্য্যচন্দ্রগ্রহ অণু-পরমাণু সমস্তই ঠিক সময় রেখে ঠিক নিয়ম রেখে চ'ল্‌চে—এই কথাটা যত বড়ো কথাই হোক্ না, কেবল তাতে আমাদের মন ভরে না। আমরা এই কথা বলি, শুধু বীণার নিয়ম চাইনে, বীণার সঙ্গীত চাই। সঙ্গীতটি যখন শুন্‌তে পাই, তখনি ঐ বীণাযন্ত্রের শেষ অর্থটি পাই—তা নইলে ও কেবল খানিকটা কাঠ এবং পিতল। জগতের এই বীণাযন্ত্রে আমরা সঙ্গীতও শুনেচি; শুধু কেবল নিয়ম নয়। সকাল বেলার আলোতে আমরা শুধু কেবল মাটিজল, শুধু কেবল কতকগুলো জিনিষ দেখ্‌তে পাই, তা নয়। সকাল বেলার শান্তি, স্নিগ্ধতা, সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা সে তো কেবল বস্তু নয়, সেই হ'চ্চে সকালের বীণাযন্ত্রের সঙ্গীত। তা'রই সুরে আমাদের হৃদয় পাখীর সঙ্গে

মিলে গান গাইতে চায়। যেখানে বীণা শুধু বীণা, সেখানে সে বস্তুমাত্র—কিন্তু যেখানে বীণায় সঙ্গীত ওঠে, সেখানে বীণার পিছনে আমাদের ওস্তাদ্‌জি আছেন। সেই ওস্তাদ্‌জির আনন্দই গানের ভিতর দিয়ে আমাদের আনন্দ দেয়। সৃষ্টির বীণা তো ওস্তাদ্‌জি বাজিয়ে চ'লেচেন, কিন্তু আমাদের নিজের চিত্তের বীণাও যদি সুরে না বাজে তাহ'লে আমাদের হৃদয়বীণার ওস্তাদ-জিকে চিন্‌বো কী ক'রে? তাঁর আনন্দরূপ দেখ্‌বো কী ক'রে? না যদি দেখি তাহ'লে কেবল বেসুর, কেবল ঝগড়া-বিবাদ, কেবল ঈর্ষা-বিদ্বেষ, কেবল কৃপণতা, স্বার্থ-পরতা, কেবল লোভ এবং ভোগের লালসা। আমাদের জীবনের মধ্যে যখন সঙ্গীত বাজে তখন নিজেকে ভুলে যাই। আমাদের জীবনযন্ত্রের ওস্তাদ্‌জিকেই দেখ্‌তে পাই। তখন দুঃখ আমাদের অভিভূত করে না, ক্ষতি আমাদের দরিদ্র ক'রে দেয় না, তখন ওস্তাদ্‌জির আনন্দের মধ্যে আমাদের জীবনের শেষ অর্থটি দেখ্‌তে পাই। সেইটি দেখ্‌তে পাওয়াই মুক্তি। সেইজন্যই তো চিত্তবীণায় সত্যসুরে তার বাঁধ্‌তে চাই, সেইজন্যে কঠিন চেষ্টায় মনকে বশ ক'র্‌তে চাই, চৈতন্যকে নির্ম্মল ক'রে তুল্‌তে চাই—সেইজন্যে নিজের স্বার্থ নিজের ক্ষুদ্র

আকাঙ্ক্ষা ভুলে হৃদয়কে স্তব্ধ ক'র্‌তে চাই—তা হ'লেই আমার সুরবাঁধা যন্ত্র ওস্তাদের হাতে বেজে উঠ্‌বে; আমাদের প্রার্থনা হ'চ্চে এই ঃ—"তব অমল পরশ রস অন্তরে দাও।" তাঁর সেই স্পর্শের রসই হ'চ্চে আমাদের অন্তরের সঙ্গীত। তুমিও জানো, আমি সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই গান করি—

বীণা বাজাও হে, মম অন্তরে।
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে
আনন্দিত তান শুনাও হে, মম অন্তরে।

দুপুর বেলা খেতে গিয়ে দেখি, খাবার টেবিলে তোমার চিঠি আর সেই হিন্দী খবরের কাগজ র'য়েচে। তোমরা আলমোড়ায় যাচ্চো। ওখানে আমি অনেকদিন ছিলুম। তোমাদের ঠিকানা পেলে সেই ঠিকানায় লিখ্‌বো। আমি ভেবেছিলুম, তোমাদের স্কুলের ছুটির আগে তোমরা কোথাও যাবে না। কিন্তু দেখ্‌চি আমার ছেলেবেলাকার হাওয়া তোমাদের লেগেচে—তখন আমি কেবলি ইস্কুল পালিয়েচি। কিন্তু সাবধান আমার মতো মূর্খ হ'লে চ'ল্‌বে না—নাম্‌তা মনে থাকা চাই, আর সাইবীরিয়ার রাস্তা ভুল্‌লে কষ্ট পাবে।

১১

শান্তিনিকেতন

তুমি বোধ হয় এই প্রথম হিমালয়ে যাচ্চো। আমিও প্রায় তোমার বয়সে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়ে গিয়েছিলুম। তা'র আগে ভূগোলে প'ড়েছিলুম, পৃথিবীতে হিমালয়ের চেয়ে উঁচু জিনিষ আর কিছু নেই, তাই হিমালয় সম্বন্ধে মনে মনে কত কী-যে কল্পনা ক'রেছিলুম তা'র ঠিক নেই। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মনটা একেবারে তোলপাড় ক'রেছিলো। অমৃতসর হ'য়ে ডাকের গাড়ি চ'ড়ে প্রথমে পাঠানকোটে গিয়ে প'ড়লুম। সেখানে পাহাড়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। তুমি কাঠ-গোদাম দিয়ে উপরে উঠেচো,—পাঠানকোট সেই রকম কাঠগোদামের মতো। সেখানকার ছোটো ছোটো পাহাড়গুলো, "কর, খল" "জল পড়ে, পাতা নড়ে",—এর বেশি আর নয়। তা'রপরে ক্রমে ক্রমে যখন উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম, তখন কেবল এই কথাই মনে হ'তে লাগ্‌লো, হিমালয় যত বড়োই হোক্ না, আমার কল্পনা তা'র চেয়ে তাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েচে; মানুষের প্রত্যাশার কাছে হিমালয় পাহাড়ই বা লাগে কোথায়?

আসল কথা, পাহাড়টা থাকে-থাকে উপরে উঠেচে ব'লে, ডাণ্ডি ক'রে চ'ড়তে চ'ড়তে, পর্ব্বতরাজের রাজমহিমা ক্রমে ক্রমে মনের মধ্যে স'য়ে আসে। যে-জিনিষটা খুব বড়ো, আমরা একেবারে তা'র সমস্তটা তো দেখ্‌তে পাইনে—পর্ব্বত ক্রমে ক্রমে দেখি, সমুদ্র ক্রমে ক্রমে দেখি—এমন কি, যে-মানুষ আমার চেয়ে বয়সে অনেক বেশি তা'র সেই বড়ো বয়সের সুদীর্ঘ বিস্তারটা এক সঙ্গে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এই জন্যে তফাৎ জিনিষটা কল্পনায় যত বড়ো, প্রত্যক্ষে তত বড়ো নয়। অর্থাৎ বড়ো হ'লেও বড়ো দেখা যায় না। আমাদের যে-ঠাকুরকে আমরা প্রণাম করি, তিনি যত বড়ো তা'র সমস্তটা যদি সম্পূর্ণ আমাদের সাম্‌নে আস্‌তো, তা-হ'লে সে আমরা সইতেই পারতুম না। কিন্তু হিমালয় পাহাড়ের মতো আমরা তাঁর বুকের উপর দিয়ে ক্রমে ক্রমে উঠি। যতই উঠি না কেন, তিনি আমাদের একেবারে ছাড়িয়ে যান না,—বরাবর আমাদেব সঙ্গী হ'য়ে তিনি আমাদের আপনি উঠিয়ে নিতে থাকেন; বুদ্ধিতে বুঝ্‌তে পারি তিনি আমাদের ছাড়িয়ে আছেন, কিন্তু ব্যবহারে বরাবর তা'র সঙ্গে আমাদের সহজ আনাগোনা চ'ল্‌তে থাকে। তাই তো তাঁকে বন্ধু ব'ল্‌তে আমাদের কিছু ঠেকে না—

তিনিও তাঁব উপরের থেকে হেসে আমাদের বন্ধু বলেন। এত উপরে চ'ড়ে যান না-যে, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া দায় হ'য়ে ওঠে। তুমি যত জোরের সঙ্গে আমাকে সাতাশ বছরের ক'রে নিয়েচো, আমরা তা'র চেয়ে ঢের বেশি জোরে তাঁকে সাতও ক'র্‌তে পারি সাতাশও ক'র্‌তে পারি—আবার সাতাশ কোটি ক'র্‌লেও চলে; তিনি-যে আমাদের জন্য সবই হ'তে পারেন, তা নইলে তাঁকে দিয়ে আমাদের চ'ল্‌তোই না। তোমার পাহাড় কেমন লাগ্‌লো, আমাকে লিখো। হিমালয়ে আলমোড়া-পাহাড়ের চেয়ে ভালো পাহাড় ঢের আছে, আলমোড়া ভারি নেড়া পাহাড়; ওর গাছপালা নেই আর ওখানে থেকে হিমালয়ের তুষার-দৃশ্য তেমন ভালো ক'রে দেখা যায় না। ইতি ১লা ভাদ্র, ১৩২৫।

১৩

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি পেলুম। তখন তো আমার সময় থাকে না, তাই এখন খাওয়ার পরে লিখ্‌তে ব'সেচি। আর খানিক পরে ম্যাট্রিক্‌-ক্লাসের

ছেলেরা দল বেঁধে খাতাপত্র নিয়ে হাজির হবে। তুমি যে-নিয়ম ক'রে দিয়ে গিয়েছিলে, আজকাল সে আর পালন করা হ'য়ে ওঠে না ; খাওয়ার পরে দুপুর-বেলায় শোওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েচি—সেই ডেস্কের সাম্‌নে সেই চৌকি নিয়ে আমার দিন কাটে। সে জন্যে আমার নালিশ নেই, কাজের দরকার প'ড়লেই কাজ ক'রতে হবে। পৃথিবীতে ঢের লোক আমার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করে—সেও আবার অফিসের কাজ— অর্থাৎ সে-কাজ পেটের দায়ে, মনের আনন্দে নয়। আমি-যে ছেলেদের পড়াই, সে তো দায়ে প'ড়ে নয়, সে নিজের ইচ্ছায়—অতএব এ রকম কাজ ক'র্‌তে পারা তো সৌভাগ্য। কিন্তু তবু এক একবার দরজার ফাঁকের ভিতর দিয়ে এই সবুজ পৃথিবীর একটা আভাস যখন দেখ্‌তে পাই তখন মনটা উতলা হ'য়ে ওঠে। আমি-যে জন্মকুঁড়ে। যেমন বাঁশির ফাঁকের ভিতর দিয়ে সুর বেরোয়, তেমনি আমার কুঁড়েমির ভিতর থেকেই আমার যেটি আসল কাজ সেইটি জেগে ওঠে। আমার সেই আসল কাজই হ'চ্চে বাণীর কাজ। সময়টাকে কর্ত্তব্য দিয়ে ভরাট ক'রে একেবারে নিরেট ক'রে দিলে বাণী চাপা প'ড়ে যায়। সেই জন্যই আমাকে কেবল

কাজ থেকে নয়, সংসারের নানা জটিল বন্ধন থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থাক্‌তে হয়। কাজই হোক্, আর মানুষই হোক্, আমাকে একেবারে চাপা দিলে বা বেঁধে ফেল্লে আমার জীবন ব্যর্থ হ'তে থাকে। আমার মন ওড়্‌বার জন্যে শূন্যকে চায়। তাকে খাঁচায় বাঁধ্‌বার আয়োজন যতবার হ'য়েচে, সেই আয়োজনের শিকল ছিন্ন হ'য়ে প'ড়ে গেচে। হঠাৎ একদিন দেখ্‌তে পাবে আমার কাজকর্ম্মের দাঁড়খানা তা'র শিকল নিয়ে কোথায় প'ড়ে আছে, আর আমি অত্যুচ্চ অবকাশের আগ্‌ডালের উপর অসীম ফাঁকার মধ্যে এক্‌লা ব'সে গান জুড়ে দিয়েচি। তাই ব'ল্‌চি—দরজা-জান্‌লার আড়াল থেকে ঐ নীলে-সবুজে-সোনালিতে মেশানো ফাঁকার একটা অংশ যেম্‌নি দেখ্‌তে পাই, অম্‌নি আমার মন ডেস্কের ধার থেকে ব'লে ওঠে—ঐখানেই তো আমার জায়গা, ঐ ফাঁকাটাকে-যে আমার আনন্দ দিয়ে, গান দিয়ে ভ'রে তুল্‌তে হবে। পুকুর আছে মাটির বাঁধ দিয়ে ঘেরা—সেইখানেই তা'র কাজ, কেউবা স্নান ক'র্‌চে, কেউবা জল তুল্‌চে, কেউবা বাসন মাজ্‌চে। কিন্তু আমি হ'চ্চি মেঘের মতো; আমাকে তো তটের ঘের দিলে চ'ল্‌বে না, আমাকে বাঁধ্‌তে গেলে

তো বাঁধা প'ড়বো না---আমাকে-যে ঐ শূন্যের ভিতর দিয়ে বর্ষণ ক'র্তে হবে। সব সময়েই-যে বৃষ্টি ভ'রে আসে তা নয়, অনেক সময়ে অলস-স্বপ্নের মতো সূর্য্যের আলোতে রঙিয়ে উঠে কিছুই না ক'রে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু এই কুঁড়েমিটুকু উপর থেকে আমার জন্যে বরাদ্দ হ'য়ে গেচে, এজন্যে আমি কারো কাছে দায়িক নই। সবই তো বুঝ্লুম, কিন্তু কুঁড়েমি করি কখন বলো তো? তুমি তো দেখেই গেচো কাজের আর অন্ত নেই। ঘোড়াকে বিধাতা বাতাসের মতো দ্রুতগামী এবং মুক্ত ক'রে সৃষ্টি ক'রেছিলেন, কিন্তু সেই ঘোড়াকেই মানুষ জিনে লাগামে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলে। আমারও সেই দশা। বিধাতার ইচ্ছা ছিল—আমি ভরপূর কুঁড়েমি ক'রে কাটাই, কিন্তু যে-গ্রহের হাতে প'ড়েচি, সে আমাকে ক'ষে খাটিয়ে নিচ্চে। বয়স যখন অল্প ছিল, তখন খাটুনি এড়িয়ে, ইস্কুল পালিয়ে পদ্মার নির্জ্জন চরে বোটের মধ্যে লুকিয়ে বেশ চালাচ্ছিলুম—কিন্তু যখন থেকে তোমার পঞ্জিকা অনুসারে আমার 'সাতাশ' বছর বয়স হ'য়েচে, তখন থেকেই কাজের টানে আপনি ধরা দিয়ে কেটে বেরোবার আর পথ পাইনে। নইলে আগেকার মতো হ'লে আমার পক্ষে আলমোড়ায় যেতে

কতক্ষণ লাগ্‌তো বলো ? তবু তোমরা সেই পাহাড়ের উপরে মুক্ত হাওয়ায় স্বাস্থ্য এবং আনন্দ ভোগ ক'র্‌চো এ কথা মনে ক'রে ভালো লাগ্‌চে ; তোমার চিঠি সেখানকার লাল ফুলের পাপ্‌ড়িতে রাগ-রক্ত হ'য়ে আমার হাতে এসে পৌঁচচ্চে। সেখানকার ফুলে যে-রক্তিমা দেখ্‌তে পাচ্চি, তোমার গালে সেই রক্তিমা সংগ্রহ ক'রে আন্‌বে—এই আশা ক'রে আছি। আজ আর সময় নেই—অতএব ইতি। ১১ই ভাদ্র, ১৩২৫।

১৪

শান্তিনিকেতন

আমাদের এখানে প্রায়ই খুব বৃষ্টি হ'চ্চে। এক একদিন বিষম জোরে বাতাস দেয় আর বৃষ্টির ধারা-গুলো বেঁকে একেবারে তীরের মতো সিধে ঘরের মধ্যে চ'লে আসে। এখানে গরম নেই ব'ল্লেই হয়—আর চারিদিকের মাঠ একেবারে ঘন সবুজ হ'য়ে উঠেচে। বোলপুরকে এত সবুজ আমি আর কখনোই দেখিনি। গাছগুলো নিবিড় পাতাব ভারে থাকে-থাকে ফুলে উঠেচে—ঠিক যেন সবুজ মেঘের ঘটার মতো। আমাদের

বিদ্যালয়ের কুয়োগুলো প্রায় কানায় কানায় ভরা। এবারে চারিদিকে অনেক গাছ পুঁতে দিয়েচি। সে-গুলো যখন বড়ো হ'য়ে উঠ্‌বে, তখন আমাদের আশ্রম আরও সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌বে। কিন্তু এখানকার শুক্‌নো বেলেমাটিতে গাছপালা ভারি দেরিতে বেড়ে ওঠে—আমি আটাশ বছরে পড়বার আগে এ সব গাছে ফুলধরা দেখ্‌তে পাবো না। তুমি যদি নবেম্বরে আমাদের আশ্রমে আসো, তা হ'লে ততদিনে এখানে অনেক বদল দেখ্‌তে পাবে। এ বৎসরটা আমাদের আশ্রমের পক্ষে খুব তেজের বৎসর;—যেমন ঘন ঘন বৃষ্টিতে গাছপালা দেখ্‌তে দেখ্‌তে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌চে, তেম্‌নি এখানকার কাজের দিকেও খুব একটা উৎসাহ প'ড়ে গেচে। পড়াশুনো কাজকর্ম্ম যেন নতুন জোর পেয়েচে; সেই জন্যে ছেলেদের মধ্যেও খুব একটা আনন্দ জেগে উঠেচে। আমি-যে আমেরিকায় যাবার টিকিট কিনেও গেলুম না, এখানে থেকে গেলুম, তা'র পুরস্কার পেয়েচি। আমাদের আশ্রম-লক্ষ্মী বোধ হয় আমার অদৃষ্টের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে আমার বিদেশে-যাওয়া কাটিয়ে দিয়েচেন। খুব ভালোই হ'য়েচে। আমি "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" ইংরেজিতে তর্জ্জমা ক'রেচি, তা

জানো ; এণ্ড্রুজ্ সে-টা প'ড়ে খুব হেসেচেন, আর খুব লাফালাফি ক'রেচেন ইতি ১৬ই ভাদ্র, ১৩২৫।

১৫

শান্তিনিকেতন

কাল রাত্রি থেকে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন—মাঝে মাঝে প্রবল জোরে বর্ষণ নেমে আস্‌চে—অম্‌নি দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত মাঠ জলে ছল্ ছল্ ক'বে উঠ্‌চে—থেকে থেকে অশান্ত বাতাস সোঁ সোঁ ক'রে হূহু ক'রে আমাদের শালবনেব ডালপালাগুলোর মধ্যে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে লুটিয়ে প'ড়্‌চে—ঠিক যেন আকাশের অনেক দিনের একটা চাপা বেদনা কিছুতেই আর চাপা থাক্‌চে না। ওদিকে দিগন্তের কোণে কোণে রাগী-রকমের ভ্রূকুটি দেখা দিয়েচে—আর তা'র মধ্য দিয়ে একটা ফ্যাকাশে আলো দারুণ হাসির মতো। সবশুদ্ধ জলে-স্থলে একটা ক্ষ্যাপাটে রকমের ভাব। মনে হ'চ্চে যেন ছুটন্ত উচ্চৈশ্রবার উপরে চ'ড়ে ইন্দ্রদেব একটা ঘুর্ণাঝড়ের চক্র পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে মেরেচেন। বাতাসের আর্ত্তনাদ আর তা'র বেগ ক্রমেই বেড়ে

উঠ্‌চে—একটা রীতিমতো ঝড়ের আয়োজন ব'লেই বোধ হ'চ্চে। আমার এই দোতালার কোণটি ঝড়ের পক্ষে খুব-যে ভালো আশ্রয়—তা নয়। আধুনিক কালের যুদ্ধক্ষেত্রের trench-এর মতো যথেষ্ট প্রকাশ্যও নয়, যথেষ্ট প্রচ্ছন্নও নয়—ভালো ক'রে ঝড়টা দেখ্‌তে পাচ্চিনে, অথচ ঝড়ের ঝাপট থেকে ভালো ক'রে রক্ষাও পাচ্চিনে। সিঁড়ির সাম্‌নের দরজাটা বন্ধ ক'র্‌তে হ'য়েচে, ঘরের দরজাও সব বন্ধ—অন্ধকার, কোথা থেকে বেঁকেচুরে একটু বৃষ্টির ঝাপটও আস্‌চে। রুদ্রদেবের তাণ্ডবনৃত্যের এই ডমরু-ধ্বনির মধ্যে ব'সে তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি।

সেদিন তুমি আমাকে লিখেছিলে-যে, তুমি আমার অনেক নতুন নতুন নাম ঠিক ক'রে রেখেচো। ক্রমে একে একে বোধ হয় শুন্‌তে পাবো, কিন্তু আমার আসল নামটা যেন একেবারে চাপা না প'ড়ে যায়,—কেন না, ঐ নামটা নিয়ে এতদিন একরকম কাজ চালিয়ে এসেচি। তা ছাড়া ওর একটা মস্ত সুবিধা এই-যে, কবির সঙ্গে রবির একটা মিল আছে;—এর পরে যারা আমার নামে কবিতা লিখ্‌বে, তাদের অনেকটা কষ্ট বাঁচ্‌বে। ইতি—২০শে ভাদ্র, ১৩২৫।

১৬

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি এইমাত্র পেলুম। আজ আমার চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্গের পুরাতন পড়ার দিন, আজ সন্তোষের হাতে তাদের ভার ; এইজন্যে আমার সকালের কাজের প্রথম দুই ভাগ আমার ছুটি, তাই এখনি তোমার চিঠির জবাব দিতে বস্‌বার সময় পেলুম। সেদিন যখন তোমাকে লিখ্‌ছিলুম, তখন আকাশ জুড়ে মেঘের হাঁক্‌ডাক্‌ এবং মাঠে-বনে পাগ্‌লা হাওয়ার দৌরাত্ম্য চ'ল্‌ছিলো ; আজ সকালে তা'র আর কোনো চিহ্ন নেই, আজ শরৎকালের প্রসন্ন মূর্ত্তি প্রকাশ পেয়েচে—শিবের জটা ছাপিয়ে যেন গঙ্গা ঝ'রে প'ড়্‌চে,—আকাশে তেম্‌নি আজ আলোকের নির্ম্মল ধারা ঢেলে দিয়েচে, পৃথিবী আজ মাথা নত ক'রে তা'র অশ্রু-আর্দ্র হৃদয়খানি মেলে দিয়েচে, আর আকাশের কোন্ তরুণ দেবতা হাসিমুখে তা'র উপরে এসে দাঁড়িয়েচেন। জলস্থল শূন্যতল আজ একটি জ্যোতির্ম্ময় মহিমায় পূর্ণ হ'য়ে উঠেচে। সেই পরিপূর্ণতায় চারিদিক শান্ত স্তব্ধ, অথচ গোলমাল-যে কিছু নেই, তা নয়। জাগ্রত

প্রভাতের কাজকর্ম্মের কলধ্বনি উঠেচে। আমার ঠিক সাম্‌নেই 'দিনুবাবুর' ঘরের দোতালায় রাজমিস্ত্রী ও মজুরের দল নানারকম ডাক্‌হাঁক্ এবং ঠুক্‌ঠাক্ লাগিয়ে দিয়েচে। দূরে থেকে ছেলেদের কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্চে, পূবদিকের সদর রাস্তা দিয়ে সার-বাঁধা গোরুর গাড়ি ইটের বোঝা নিয়ে আস্‌চে, তা'রই অনিচ্ছুক চাকার আর্ত্তনাদ এবং গাড়োয়ানের তর্জ্জন-ধ্বনির বিরাম নেই, তা'র উপরে ঠিক আমার পিছনের জানালার বাইরে সুধাকান্তর ঘরের চালের উপরে ব'সে একদল চড়ুই-পাখী কিচিমিচি ক'রে কী-যে বিষম তর্ক বাধিয়ে দিয়েচে, তা'র একবর্ণ বোঝ্‌বার জো নেই,—প্রায় ন্যায়শাস্ত্রেরই তর্কের মতো। কিন্তু তবু আজ আলোকে অভিষিক্ত আকাশের এই অন্তরতর স্তব্ধতা কিছুতেই যেন ভাঙ্‌তে পারচে না। গায়ের উপর দিয়ে হাজার হাজার যে-সব ঝরণা ঝ'রে প'ড়্‌চে, তাতে যেমন হিমালয়ের অভ্রভেদী স্তব্ধতাকে বিচলিত করে না, এও ঠিক সেই রকম। একটি তপঃ-প্রদীপ্ত অপরিমেয় মৌনকে বেষ্টন ক'রে এই সমস্ত ছোটো ছোটো শব্দের দল খেলা ক'রে চ'লেচে—তাতে তপস্যার গভীরতা আরো বড়ো হ'য়ে প্রকাশ পাচ্চে, নষ্ট হ'চ্চে না। শরতের

বনতল যেমন নিঃশব্দে-ঝ'রে-পড়া শিউলিফুলে আকীর্ণ হ'য়ে ওঠে, তেম্‌নি ক'রেই আমার মনের মধ্যে আজ শরৎ-আকাশের এই আলো শুভ্র শান্তি বর্ষণ ক'র্‌চে। ইতি ২৪শে ভাদ্র, ১৩২৫।

১৭

শান্তিনিকেতন

গেল বুধবারে সকালে আমি মন্দিরে কী ব'লেছিলুম, শুন্‌বে? আমি ব'লেছিলুম, মানুষের ছোটো আর বড়ো—দুই-ই আছে। সেই ছোটো মানুষটি জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে কয়দিনের জন্যে আপনার একটি ছোটো সংসার পেতেচে—সেইখানে তা'র যত খেলার পুতুল সাজানো—সেইখানে তা'র প্রতিদিনের আহরণ জমা হ'চ্চে আর ক্ষয় হ'চ্চে। কিন্তু মানুষের ভিতরকার বড়োটি জন্ম-মৃত্যুর বেড়া ডিঙিয়ে চিরদিনের পথে চ'লেচে, এই চল্‌বার পথে তা'র কত সুখ-দুঃখ, কত লাভ-ক্ষতি ঝ'রে প'ড়ে মিলিয়ে যাচ্চে। পৃথিবীর দুটি আবর্ত্তন আছে,—একটি আহ্নিক, একটি বার্ষিক। একটি আবর্ত্তনে সে আপনাকেই ঘুর্‌চে, আর একটিতে সে

নিজের চিরপথের কেন্দ্রস্থিত আলোকের উৎসকে প্রদক্ষিণ ক'র্‌চে। নিজেকে ঘোরবার সময় সূর্য্যের দিকে পিঠ ফেরাতেই দেখ্‌তে পায়-যে, তা'র নিজের কোনো আলো নেই, তা'র নিজের দিকে অন্ধতা, ভয়, জড়তা,—কিন্তু নিজের সেই অন্ধকারটুকুকে না জান্‌লে সূর্য্যের সঙ্গে তা'র সম্বন্ধের পূর্ণ পরিচয় সে পেতো না। আমরাও আমাদের ছোটো আবর্ত্তনে নিজেকে ঘুরি; এ ঘোরাতেই জান্‌তে পারি, আমার দিকে অন্ধকার, বিভীষিকা, মোহ, আমার দিকে ক্ষুদ্রতা; কিন্তু সেই জানার সঙ্গে সঙ্গেই যখন সেই অমৃতের উৎসকে জানি, তখন অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে আমরা যেতে থাকি। এইজন্যে আপনাকে আর তাঁকে দুইকেই একসঙ্গে জান্‌তে থাক্‌লে তবেই আমরা আমাদের বন্ধনকে নিয়ত অতিক্রম ক'র্‌তে ক'র্‌তে, মুক্তির স্বাদ পেতে পেতে, অমৃতের পাথেয় সংগ্রহ ক'র্‌তে ক'র্‌তে চিরদিনের পথে চ'ল্‌তে পারি। আমাদের ক্ষুদ্র-প্রতিদিন আমাদের বৃহৎ-চিরদিনকে প্রণাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'ল্‌তে থাক্‌বে, আমাদের ক্ষুদ্র-প্রতিদিন তা'র সমস্ত আহরণ-গুলিকে বৃহৎ-চিরদিনের চরণে সমর্পণ ক'রতে ক'রতে

চ'ল্‌বে। কিন্তু ক্ষুদ্র প্রতিদিন যদি এমন কথা ব'লে বসে-যে, আমি যা পাই, যা আনি, সব আমি নিজে জমাবো, তা হ'লেই বিপদ বাধে,—কেন না, তা'র জমাবার জায়গা কোথায়? তা'র মধ্যে এত ধরে কোথায়? তা'র এমন অক্ষয় পাত্র আছে কোন্‌খানে? পৃথিবী যেমন তা'র সোনায়-ভরা সকালটিকে এবং সোনায়-ভরা সন্ধ্যাটিকে নিজে জমিয়ে রেখে দেয় না, পূজার স্বর্ণ-কমলের মতো আপন সূর্য্য-প্রদক্ষিণের পথে প্রত্যহ প্রণাম ক'রে উৎসর্গ ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'লেচে, আমাদেরও তেম্‌নি এই ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ ভালোবাসাকে চিরদিনের চল্‌বার পথে চিরদিনের দেবতাকে উৎসর্গ ক'র্‌তে ক'র্‌তে যেতে হবে :—তা হ'লেই ছোটো-আমির সঙ্গে বড়ো-আমির মিল হবে, তা' হ'লেই আমাদের ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হবে; আপনার দিকে সমস্ত টান্‌তে গেলেই সে-টান টেঁকে না, সেই বিদ্রোহে ছোটো-আমিকে একদিন পরাস্ত হ'তেই হয়। এইজন্য ছোটো-আমি জোড়হাতে প্রার্থনা ক'র্‌চে নমস্তেঽস্তু,—বড়োকে আমার নমস্কার সত্য হোক্‌, নিজের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পাই। ইতি ২৯শে ভাদ্র, ১৩২৫।

১৮

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি পেয়েছিলুম, কিন্তু তখনি তা'র জবাব দেবার সময় পাইনি। দুপুর বেলাতেও খাবার পরে কিছু কাজ ছিল, তাই এখন বিকেলে তোমাকে তাড়াতাড়ি লিখ্‌তে ব'সেচি—ডাক যাবার আগে শেষ ক'রে ফেল্‌তে হবে। আজকাল আর বৃষ্টির কোনো লক্ষণ নেই— আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে গেচে। আমার সেই লেখ্‌বার কোণটা তো তুমি জানো—সেটা হ'চ্চে পশ্চিমের বারান্দা; সেখানে বিকেলের দিকে হেলে-পড়া সূর্য্যের সমস্ত কিরণ বন্ধ-দরজার উপরে ঘা দিতে থাকে—সশরীরে ঢুক্‌তে পায় না বটে, কিন্তু তা'র প্রতাপ অনুভব ক'র্‌তে পারি। তুমি এখন যেখানে আছো, সেখান থেকে আমার পিঠের দিকের বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক আন্দাজ ক'র্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু আমার আকাশের মিতাটি আমার সঙ্গে যেম্‌নি ব্যবহার করুন, তাঁর সঙ্গে আমার কখনই বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হয়নি। আমি চিরদিন আলো ভালোবাসি। গাজিপুরে, পশ্চিমের গরমেও, আমি দুপুর বেলায়

আমার ঘরের দরজা বন্ধ করিনি। অনেক দিন বর্ষার আচ্ছাদনের পর সেই আলো পেয়েচি,—সেই আলো আজ আমার দেহের মধ্যে, মগজের মধ্যে, মনের মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌চে। আমার সাম্‌নে পূর্ব্বদিকের ঐ খোলা দরজা দিয়ে ঐ আলো নীল আকাশ থেকে আমার ললাটে এসে প'ড়েচে, আর সবুজ ক্ষেতের উপর দিয়ে এসে আমার দুই চোখের সঙ্গে সঙ্গে যেন কানে-কানে কথা ব'ল্‌চে। পৃথিবীর ইতিহাসে কত হানাহানি কাটাকাটি হ'য়ে গেল, মানুষের ঘরে-ঘরে কত সুখ-দুঃখ, কত মিলন-বিচ্ছেদ, কত যাওয়া-আসার বিচিত্র লীলা প্রতিদিন বিস্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে গেল, কিন্তু এই শরতের সবুজটি পৃথিবীর প্রসারিত অঞ্চলের উপরে যুগে-যুগে বর্ষে-বর্ষে আপন আসন অধিকার ক'রেচে,—কিছুতেই এই সুগভীর শান্তি সৌন্দর্য্যের পবে, এই রসপরিপূর্ণ নির্ম্মলতার উপরে, কোনো আঘাত ক'র্‌তে পারেনি। সেই কথা যখন মনে করি, তখন সাম্‌নের ঐ আকাশের দিকে চেয়ে যুগযুগান্তরের সেই শান্তি আমার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত ক্ষোভকে আপন অসীমতার মধ্যে মিশিয়ে নেয়।

আমি বুধবারে কী বলি তাই তুমি শুন্‌তে

চেয়েচো। যা বলি তা আমার ভালো মনে থাকে না। এণ্ড্রুজ্ উপাসনার পরেই আমার কাছে এসে একবার ইংরেজিতে তা'র ভাবখানা শুনে নেন, তাই খানিকটা মনে পড়ে। এবারে ব'লেছিলুম, জগতে একটা খুব বড়ো শক্তি হ'চ্চে প্রাণ, অথচ সেই শক্তি বাইরের দিক থেকে কত ছোটো, কত সুকুমার, একটু আঘাতেই ম্লান হ'য়ে যায়। এমন জিনিষটা প্রতি মুহূর্ত্তে বিপুল জড়-বিশ্বের ভারাকর্ষণের সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তে লড়াই ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্চে।

বালক অভিমন্যু যেমন সপ্তরথীর ব্যূহে ঢুকে লড়াই ক'রেছিলো, আমাদের সুকুমার প্রাণ তেম্নি অসংখ্য মৃত্যুর সৈন্যদলের মধ্যে দিয়ে অহর্নিশি লড়াই ক'রে চ'লেচে। বস্তুর দিক থেকে দেখ্লে দেখা যায়, এই প্রাণের উপকরণ অতি তুচ্ছ,—খানিকটা জল, খানিকটা কয়লা, খানিকটা ছাই, খানিকটা ঐ রকম সামান্য কিছু, অথচ প্রাণ আপনার ঐ বস্তুর পরিমাণকে বহু পরিমাণে অতিক্রম ক'রে আছে। মৃত-দেহে সজীব-দেহে বস্তু-পিণ্ডের পরিমাণের তফাৎ নেই, অথচ উভয়ের মধ্যকার তফাৎ অপরিসীম। শুধু তাই নয়, সজীব বীজের বর্ত্তমান আবরণের মধ্যে মহারণ্য লুকিয়ে আছে।

ছোটোর মধ্যে এই-যে বড়োর প্রকাশ, এই হ'চ্চে আশ্চর্য্য। আরেক শক্তি হ'চ্চে, মনের শক্তি। এই মনটি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় নিয়ে এই অসীম জগতের রহস্য আবিষ্কার ক'র্‌তে বেরিয়েচে। সেই ইন্দ্রিয়গুলি নিতান্ত দুর্ব্বল। চোখ কতটুকুই দেখে, কান কতটুকুই শোনে, স্পর্শ কতটুকুই বোধ করে! কিন্তু মন এই আপন ক্ষুদ্রতাকে কেবলি ছাড়িয়ে যাচ্চে —অর্থাৎ সে যা, সে তা'র চেয়ে অনেক বড়ো। তা'র উপকরণ সামান্য হ'লেও সে অতি-ক্ষুদ্র এবং অতি-বৃহৎ অতি-নিকট এবং অতি-দূরকে কেবলি অধিকার ক'র্‌চে। তা ছাড়া, তা'র মধ্যে যে-ভবিষ্যৎ প্রচ্ছন্ন, সেও অপরি-মেয়। একটি ছোটো শিশুর মনের মধ্যেই নিউটনের, সেক্‌স্‌পীয়ারের মন লুকিয়ে ছিল। বর্ব্বরতার যে-মন পাঁচের বেশি গণনা ক'র্‌তে পার্‌তো না, তারি মধ্যে আজকের সভ্যতার মন জ্ঞানের সাধনায় অভাবনীয় সিদ্ধিলাভ ক'রেচে। শুধু তাই নয়, আরো ভবিষ্যতে সে-যে আরো কী আশ্চর্য্য চরিতার্থতা লাভ ক'র্‌বে, আজ আমরা তা কোনোমতেই কল্পনা ক'র্‌তে পারিনে। তা হ'লেই দেখা যাচ্চে, আমাদের এই-যে মন, যা এক দিকে খুব ছোটো, খুব দুর্ব্বল দেখ্‌তে, আর একদিকে

তা'র মধ্যে যে-ভূমা আছে, হিমালয়-পর্ব্বতের প্রকাণ্ড আয়তনের মধ্যে তা নেই। তেম্‌নি আমাদের আত্মা ছোটো-দেহ, ছোটো-মন, ছোটো-সব প্রবৃত্তি দিয়ে ঘেরা, অনেক সময় তাকে যেন দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না। কিন্তু তবু তা'র মধ্যেই সেই ভূমা আছেন! সেইজন্যেই তো এক দিকে আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আমাদের রাগ-বিরাগ যখন আমাদের কাছে অন্ন-বস্ত্র ও অন্য হাজার-রকম বাসনার জিনিষের জন্যে দরবার ক'র্‌চে, সেই মুহূর্ত্তেই এই প্রবৃত্তির দাস, এই বাসনার বন্দী, বিশ্বের সমস্ত সম্পদ পায়ের নীচে ফেলে, উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা ক'রেচে,—অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, যা অসীম একেবারে তাকেই চাই। এত বড়ো চাওয়ার জোর এতটুকুর মধ্যে আছে কোথায়? সে-জোর যদি না থাক্‌তো, তবে এত বড়ো কথা তা'র মুখ দিয়ে বেরোতো কেমন ক'রে? এ-কথার কোনো মানে সে বুঝ্‌তো কী ক'রে? আশ্চর্য্য ব্যাপার হ'চ্চে এই-যে, মানবের আত্মা যা নিয়ে দেখ্‌চে, শুন্‌চে, ছুঁচ্চে, খাওয়া-পরা ক'র্‌চে, তাকেই চরম সত্য ব'ল্‌তে চাচ্চে না;—যাকে চোখে দেখ্‌লো না, হাতে পেলো না, তাকেই ব'ল্‌চে সত্য। তা'র একটি মাত্র কারণ, ছোটোর মধ্যেই

বড়ো আছেন, সেই বড়োই ছোটোর ভিতর থেকে মানুষের আত্মাকে কেবলি মুক্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্চেন—তাই মানুষের আশার অন্ত নেই। এখন প্রত্যেক মানুষের কাজ হচ্চে কী? নিজের কথায়, চিন্তায়, ব্যবহারে এইটেই যেন প্রকাশ করি-যে, আমাদের মধ্যে সেই বড়োই সত্য। তা না ক'রে যদি মানুষের ছোটোটার উপরেই ঝোঁক দিই,—যে-সব বাসনা তা'র শিকল, তা'র গণ্ডী, যাতে তাকে খর্ব্ব করে, আচ্ছন্ন করে, তাকেই যদি কেবল প্রশ্রয় দিই,—তা হ'লে মানুষকে তা'র সত্য পরিচয় থেকে ভোলাই। আত্মা-যে অমর, আত্মা-যে অভয়, আত্মা-যে সমস্ত সুখ-দুঃখ, ক্ষতি-লাভের চেয়ে বড়ো, অসীমের মধ্যেই-যে আত্মার আনন্দনিকেতন, এই কথাটি প্রকাশ করাই হ'চ্চে মানুষের সমস্ত জীবনের অর্থ; এই জন্যেই আমরা এত শক্তি নিয়ে এত বড়ো জগতে জন্মেচি,—আমরা ছোটোখাটো এটা-ওটা-সেটা নিয়ে ভেবে কেঁদে ম'র্তে আসিনি। ইতি, ৪ঠা আশ্বিন, ১৩২৫।

১৯

শান্তিনিকেতন

তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেচো, "রবিদাদা" না ব'লে আমাকে আর একটা কোনো নামে সম্ভাষণ ক'র্তে পারো কিনা? মহাভারতের সময়ে মানুষের এক-একজনের দশ-বিশটা ক'রে নাম থাকতো, যার যেটা পছন্দ বেছে নিতে পার্‌তো। কিম্বা যে-ছন্দে যেটা মেলাবার সুবিধে, লাগিয়ে দিতো। অর্জ্জুনের কত নাম-যে ছিল, তা অর্জ্জুনকে রোজ বোধ হয় নাম্‌তা মুখস্থ করার মতো মুখস্থ ক'র্তে হ'তো। আমার-যে আকাশের মিতাটি আছেন, তাঁরও নামের অভাব নেই। যদি তাঁর দুটো-একটা নাম ধার ক'রে নিতে চাও, তা হ'লে বোধ হয় তাঁর বিশেষ কিছু লোকসান হবে না। কিন্তু যখন নামকরণ ক'র্বে, তখন আমার সম্মতি নিলে ভালো হয়। প্রথম যখন আমার নামকরণ হয়, তখন কেউ আমার সম্মতি নেয়নি, তবু দেখ্‌তে পাচ্চি নামটা মন্দ হয়নি,—কিন্তু হঠাৎ যদি তোমার মার্ত্তণ্ড নামটাই পছন্দ হয়, তা হ'লে কিন্তু আমি আপত্তি ক'র্‌বো। 'ভানু' নামটা যদিচ খুব সুশ্রাব্য নয়, তবু ওটা আমি একবার

নিজেই গ্রহণ ক'রেছিলুম। আর এক হ'তে পারে, যদি "কবিদাদা" বলো। নামটা ঠিক সঙ্গত হোক্ বা না হোক্, ওটা আমার নিজের কাজের সঙ্গে মেলে—

এক-যে ছিল রবি,
সে গুণের মধ্যে কবি।

কিন্তু একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখি, "প্রিয় কবিদাদা" ব'ল্লে চ'ল্‌বে না। প্রথম কারণ হ'চ্চে এই—যে, তোমার প্রিয় কবি-যে কে, তা আমি ঠিক জানিনে। খুব সম্ভব যে-লোকটা সেই আশ্চর্য্য হিন্দী দোঁহা লিখেছিলো সেই হবে। তা'র সঙ্গে ছ-অক্ষরের অনুপ্রাসে আমি-যে কোনোদিন পাল্লা দিতে পার্‌বো, এমন শক্তি বা আশা আমার নেই। দ্বিতীয় কারণ হ'চ্চে এই-যে, ইংরেজিতে 'প্রিয়' বলে না এমন মানুষই নেই—সে অমানুষ হ'লেও তাকে বলে,—এমন কি সে যদি দোঁহা না লিখ্‌তে পারে তবুও। আমার মত হ'চ্চে এই-যে, রাস্তা-ঘাটের সবাইকেই যদি 'প্রিয়' ব'ল্‌তে হবে এমন নিয়ম থাকে, তবে দুই-এক জায়গায় সে-নিয়মটা বাদ দেওয়া দরকার। অতএব আমাকে যদি শুধু "রবিদাদা" বলো, তা হ'লে আমি বারণ ক'র্‌বো না। এমন কি, যদি তোমার মার্ত্তণ্ড নামটাই পছন্দ হয়, তা হ'লে "প্রিয়

মার্ত্তণ্ড দাদা” লিখো না। তা হ’লে বরঞ্চ লিখো, “মার্ত্তণ্ডদাদা, প্রচণ্ড প্রতাপেষু।” যদি কোনোদিন তোমার সঙ্গে রাগারাগি করি, তা হ’লে ঐ নামে ডাক্‌লেই হবে।

আমাদের আশ্রমের আকাশে শারদোৎসব আরম্ভ হ’য়েচে—শিউলিবন সাড়া দিয়েচে, মালতীলতার পাতায় পাতায় শুভ্রফুলের অসংখ্য অনুপ্রাস, কিন্তু রাত্রে চাঁদের আলোয় আকাশ-জোড়া একখানি মাত্র শুভ্রতা। আমাদের লাল রাস্তার দুইধারে কাশের গুচ্ছ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বাতাসে মাথা নত ক’রে ক’রে পথিকদের শারদ-সঙ্গীত শুনিয়ে দিচ্চে। সমস্ত সবুজ মাঠে, সমস্ত শিশির-সিক্ত বাতাসে উৎসবের আনন্দ-হিল্লোল ব’য়ে যাচ্চে। অন্তরে বাইরে ছুটি, ছুটি, ছুটি—এই রব উঠেচে। ছুটিরও আর কেবল দুই সপ্তাহ বাকি আছে। আমাদের যখন ছুটি আরম্ভ, তখন তোমাদের শৈলপ্রবাস বোধ হয় সাঙ্গ হবে। পার্ব্বতী যখন হিমালয়ে তাঁর পিতৃভবনে যাবেন, তখন তোমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সেখানে থাক্‌বে না। কিন্তু হিমালয়ের খবর আমরা রাখিনে, কৈলাসের তো নয়ই; আমরা তো এই স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি, স্বর্ণকিরণচ্ছটায় শারদা

আমাদেরই ঘর উজ্জ্বল ক'রে দাঁড়িয়েচেন। গোটা-কতক মেঘ দিগন্তের কোণে মাঝে মাঝে জটলা করে; কিন্তু তাদের নন্দী-ভৃঙ্গীর মতো কালো চেহারা নয়, তা'রাও শ্বেতকিরণের মালা প'রেচে, শ্বেত চন্দনের ছাপ লাগিয়েচে—ললাটে ভ্রূকুটির লেশ নেই। ইতি, ৬ই আশ্বিন, ১৩২৫।

২০

শান্তিনিকেতন

প্রথম যখন তোমার চিঠি পেয়েছিলুম, তোমার চিঠিতে "প্রিয় রবিবাবু" প'ড়ে ভারি মজা লেগেছিলো। ভাব্‌লুম রবিবাবু আবার "প্রিয়" হবে কেমন ক'রে? যদি হ'তো "প্রিয় মিষ্টার ট্যাগোর", তা হ'লে তেমন বেমানান হ'তো না; কেন না রবিবাবু প্রিয়ও হ'তে পারে, অপ্রিয়ও হ'তে পারে, এবং প্রিয় অপ্রিয় দুইয়ের বাহিরও হ'তে পারে। তুমি যখন চিঠি লিখেছিলে, তখন রবিবাবু প্রিয়ও ছিল না, অপ্রিয়ও ছিল না, নিতান্ত কেবলমাত্র রবিবাবুই ছিল। কিন্তু চিঠির ভাষায় মিষ্টার ট্যাগোরের 'প্রিয়' ছাড়া আর কিছু

হবার জো নেই, তা আমার সঙ্গে তোমার ঝগ্‌ড়াই থাক্ আর ভাবই থাক্। আজকাল রবিবাবু পরীক্ষায় একেবারে দু-তিন ক্লাশ উঠে "রবিদাদা" হ'য়েচে, কিন্তু যদি "প্রিয় রবিদাদা" লেখো, তবে তোমার সঙ্গে আমার ঝগ্‌ড়া হবে। আর যদি বিশুদ্ধ বাংলামতে 'প্রিয়' লেখা হয়, তা হ'লে আপত্তি নেই বটে, তবু যখন আমি "রবিদাদা" তখন ওটা বাদ দিলেও চলে—ও যেন সকালবেলায় বাতি জ্বালানো, যেন, যার ফাঁসি হ'য়েচে, তাকে কুড়ি বৎসর দ্বীপান্তর দেওয়া। অতএব আমি যেন থানধুতি-পরা ঠাকুরদাদা, আমার কোনো পাড় নেই, আমি নিতান্তই যেন সাদা "রবিদাদা," কী বলো?

তোমরা মুক্তেশ্বরে গেচো শুনে সুখী হ'লুম। আমি ভ্রমণ ক'র্‌তে ভালোবাসি, কিন্তু ভ্রমণের কল্পনা ক'র্‌তে আমার আরো ভালো লাগে। কেন না, কল্পনার বেলায় রেলগাড়ি ঘটর ঘটর করে না, বেরেলিতে তিন চার ঘণ্টা ব'সে থাক্‌তে হয় না, ডাণ্ডি অতি অনায়াসে এবং ঠিক সময়েই মেলে। তুমি তোমার নবীন দৃষ্টি নিয়ে নতুন নতুন দৃশ্য দেখ্‌চো, তোমার সেই আনন্দ আমি মনে মনে অনুভব ক'র্‌চি। আমি আমার এই

খোলা ছাদে লম্বা কেদারায় শুয়ে শুয়ে, গিরিতটে তোমার দেবদারুবনে ভ্রমণের সুখ মনে মনে সঞ্চয় করি। আমিও প্রায় তোমার বয়সেই হিমালয়ে গিয়েছিলুম,—ড্যাল্‌হৌসীতে বক্রোটা শিখরের উপরে থাক্‌তুম। এক একদিন আমাদের বাড়ির খানিক নীচে এক দেবদারুবনে সকালে এক্‌লা বেড়াতে যেতুম। আমি ছিলুম ছোট্ট (তখন লম্বায় ছ-ফুট ছিলাম না), তাই গাছগুলোকে এত প্রকাণ্ড বড়ো মনে হ'তো—সে আর কী ব'ল্‌বো? সেই সব গাছের সুদীর্ঘ ছায়ার মধ্যে নিজেকে দৈত্যলোকের অতি ক্ষুদ্র এক অতিথি ব'লে মনে হ'তো। কিন্তু সেই আমার ছেলেবেলাকার পর্ব্বত, ছেলেবেলাকার বন এখন আর পাবো কোথায়? এখন আমার মনটা এই জগতের পথে এত নিজের সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে চলে-যে, নিজের চলার ধূলোয় এবং নিজের রথের ছায়ায় জগৎটা বারো আনা ঢাকা প'ড়ে যায়—বাজে ভাবনার ঝোঁকের মধ্য দিয়ে জগৎটাকে আর তেমন ক'রে দেখা যায় না। তাই আজ তুমি যে-পাহাড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চো, মনে হ'চ্চে সে আমার সেই অল্প বয়সের পৃথিবীর পাহাড়, আমার সেই ৪৫।৪৬ বৎসরের আগেকার।

আমরা পুরাণো হ'য়ে উঠে নিজের হাজার রকম চিন্তায় এই পৃথিবীটাকে যতই জীর্ণ ক'রে দিই না কেন, মানুষ আবার ছেলেমানুষ হ'য়ে, নূতন হ'য়ে, চিরনূতন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। শুধু একদল মানুষ যদি চিরকালই বৃদ্ধ হ'তে হ'তে পৃথিবীতে বাস ক'র্‌তো, তা হ'লে বিধাতার এই পৃথিবী তাদের নস্যে, তামাকের ধোঁয়ায়, তাদের পাকা বুদ্ধির আওতায়, একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে যেতো, স্বয়ং বিধাতা তাঁর নিজের সৃষ্টি ঐ পৃথিবীকে চিন্‌তে পার্‌তেন না। কিন্তু জগতে শিশুর ধারা কেবলি আস্‌চে। নবীন চোখ, নবীন স্পর্শ, নবীন আনন্দ ফিরে ফিরে মানুষের ঘরে অবতীর্ণ হ'চ্চে। তাই প্রাচীনদের অসাড়তার আবর্জ্জনা দিনে-দিনে. বারে-বারে, ধুয়ে-মুছে পৃথিবীর চিররহস্যময় নবীন রূপকে উজ্জ্বল ক'রে রাখ্‌চে। অন্য মানুষের সঙ্গে কবিদের তফাৎ কী, জানো? বিধাতার নিজের হাতে তৈরী শৈশব কবিদের মন থেকে কিছুতে ঘোচে না। কোনোদিন তাদের চোখ বুড়ো হয় না, মন বুড়ো হয় না। তাই চিরনবীন এই পৃথিবীর সঙ্গে তাদের চিরদিনের বন্ধুত্ব থেকে যায়, তাই চিরদিনই তা'রা ছোটোদের সমবয়সী হ'য়ে থাকে। সংসারে

বিষয়ের মধ্যে যারা বুড়ো হ'য়ে গেচে, তা'রা চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-তারার চেয়ে বয়সে বড়ো হ'য়ে ওঠে, তা'রা হিমালয়ের চেয়ে বড়োবয়সের। কিন্তু কবিরা সূর্য্য, চন্দ্র, তারার ন্যায় চিরদিনই কাঁচাবয়সী—হিমালয়ের মতোই তা'রা সবুজ থাকে, ছেলেমানুষীর ঝরণাধারা কোনোদিনই তাদের শুকোয় না; লোকালয়ে বিশ্ব-জগতের নবীনতার বার্ত্তা এবং সঙ্গীত চিরদিন তাজা রাখ্‌বার জন্যেই কবিদের দরকার—নইলে তা'রা আর সকল বিষয়েই অদরকারী।

উচ্চ-হাসে সকৌতুকে চির-প্রাচীন গিরির বুকে
ঝ'রে পড়ে চির-নূতন ঝর্‌ণা;
নৃত্য করে তালে তালে প্রাচীন বটের ডালে ডালে
নবীন পাতা ঘন-শ্যামল-বর্ণা।
পুরাণো সেই শিবের প্রেমে নূতন হ'য়ে এলো নেমে
দক্ষসুতা ধরি' উমার অঙ্গ,
এম্‌নি ক'রে সারাবেলা চ'ল্‌চে লুকোচুরি খেলা
নূতন পুরাতনের চিররঙ্গ।

ইতি, ১৪ই আশ্বিন, ১৩২৫।

২১

শান্তিনিকেতন।

আচ্ছা বেশ, রাজি। ভানুদাদা নামই বহাল হ'লো। এ নামে আজ পর্য্যন্ত আমাকে কেউ ডাকেনি, আর কেউ যদি ডাকে তবে তা'র উত্তর দেবো না। সিণ্ডারেলার গল্প জানো তো? তা'র এক-পাটি জুতো নিয়ে রাজার ছেলে পা মেপে বেড়াতে লাগ্‌লো। আমার ভানু নামটা সেই রকম একপাটি; যদি কেউ ব্যবহার ক'র্‌তে যায়, আমি তখন ব'ল্‌তে পার্‌বো—আচ্ছা আগে নিজের নামের পাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যার নাম সুরবালা, সে ব'ল্‌বে সুরো সুরু সুরি—কিছুতেই ভানুর সঙ্গে মিল্‌বে না, যার নাম মাতঙ্গিনী সে ব'ল্‌বে মাতু, মাতি, মাতো—কিছুতেই মিল্‌বে না, তিনকড়িরও সেই দশা, কাত্যায়নীরও তাই; জগদম্বা, পীতাম্বরী, গুরুদাসী, শঙ্খেশ্বরী, নগেন্দ্র-মোহিনী, কারোই কাছে ঘেঁষবার জো নেই। ভারি সুবিধে হ'য়েচে। কেবল আমার মনে ভারি ভয় র'য়ে গেল, পাছে কারো নাম থাকে "কানু

বিলাসিনী"। তবে তাকে কী ব'লে ঠেকাবো? তুমি ভেবে রেখে দিয়ো।

ছুটির দিন এলো—পর্শু ছুটি, তারপরে কী ক'র্‌বো? তখন কেবল শিউলিবন, শিশির-ভেজা ঘাস, আর দিগন্ত-প্রসারিত মাঠ আমার মুখ তাকিয়ে থাক্‌বে। তা'রা তো আমার কাছে ইংরেজি শিখ্‌তে চায় না—তা'রা চায় আমাব মনের মধ্যে যে আনন্দেব সোনার কাটি আছে সেইটে ছুঁইয়ে দিয়ে তাদের জাগিয়ে তুল্‌বো এবং আমার চেতনার সঙ্গে তাদের সৌন্দর্য্যকে মিলিয়ে দেবো। আমার জাগরণের ছোঁয়াচ্ না লাগ্‌লে পরে প্রকৃতি জাগ্‌বে কী ক'রে? নীলাকাশের কিরণ-কমলের উপরে শারদলক্ষ্মী আসন-গ্রহণ করেন, কিন্তু আমার আনন্দ-দৃষ্টি না প'ড়্‌লে পরে সে পদ্মই ফোটে না।

আজ বুধবার। আজ মন্দিরে ছুটির ঠাকুরের কথা ব'লেচি। যখন আমরা কাজ ক'র্‌তে থাকি, তখন শক্তির সমুদ্র থেকে আমাদের মধ্যে জোয়ার আসে, তখন আমরা মনে করি এ শক্তি আমারই এবং এই শক্তির জোরেই আমরা বিশ্বজয় ক'র্‌বো। কিন্তু শক্তিকে বরাবর খাটাতে তো পারিনে—সন্ধ্যা যখন আসে

তখন তো কাজ বন্ধ হয়, তখন তো আর গাণ্ডীব তুল্‌তে পারিনে। তাই জোয়ার ভাঁটার ছন্দকে জীবের মেনে চলা চাই। একবার আমি, একবার তুমি। সেই তুমিকে বাদ দিয়ে যখন মনে করি আমিই কর্ত্তা, তখনই জগতে মারামারি বেধে যায়—রক্তে ধরণী পঙ্কিল হ'য়ে ওঠে। মা তাঁর মেয়েকে ডেকে বলেন, সংসারের কাজে তুমি আমার সঙ্গে লেগে যাও, মেয়ে তখন কোমর বেঁধে লাগে, কিন্তু সে যখন ভুলে যায়-যে, এই কাজ তা'র মায়ের সংসারেরই কাজ, যখন অহঙ্কার ক'রে ভাবে 'আমি যেমন ইচ্ছা তাই ক'র্‌বো', তখন সে সংসারের ব্যবস্থাকে উলট্ পালট্ ক'রে জঞ্জাল জমিয়ে তোলে—অবশেষে এমন হয়-যে, মা ঝাঁটা হাতে নিয়ে সমস্ত আবর্জ্জনা ঝেঁটিয়ে ফেলেন। মেয়ের সেই কাজটুকুর উপরে ঝাঁটা পড়ে না—যখন সে-কাজ মায়ের সংসার-ব্যবস্থার সঙ্গে মেলে। সংসার-স্থিতির সঙ্গে এই-যে মিলিয়ে কাজ করা, এতে আমাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে—অর্থাৎ মিল রেখেও আমরা তা'র মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য রাখ্‌তে পারি—তাতেই সৃষ্টির বৈচিত্র্য। মেয়ের হাতের কাজটুকু মায়ের অভিপ্রায়কে প্রকাশ ক'রেও নিজেকে বিশিষ্টভাবে প্রকাশ ক'রতে

পারে। যখন তাই সে করে তখন তা'র সেই সৃষ্টি মায়ের সৃষ্টির সঙ্গে মিলে স্থিতি লাভ করে। বিশ্বকর্ম্মার কাজে আমরা যখন যোগ দিই তখন যে-পরিমাণে তাঁ'র সঙ্গে মিল রেখে, ছন্দ রেখে চলি সেই পরিমাণে আমাদের কাজ অক্ষয়কীর্ত্তি হ'য়ে ওঠে,—যে-পরিমাণে বাধা দিই সেই পরিমাণে আমরা প্রলয়কে ডেকে আনি। নিজের জীবনকে এই প্রলয় থেকে যদি বাঁচাতে চাই তা হ'লে প্রতিদিনই আমি-তুমির ছন্দ মিলিয়ে চ'ল্‌তে হবে—সেই ছন্দেই মানুষের সৃষ্টি, মানুষের ইতিহাস অমরতা লাভ করে। দেখ্‌চো তো, মা আজ পশ্চিমের ঘরে কী রকম প্রলয়ের সম্মার্জ্জনী নিয়ে বেরিয়েচেন। পশ্চিমের সভ্যতা মনে ক'র্‌ছিলো, তা'র শক্তি তা'র নিজেরই ভোগ নিজেরই সমৃদ্ধির জন্যে। সে আমি-তুমির ছন্দকে একেবারে মানেনি। কিছুদূর পর্য্যন্ত সে বেড়ে উঠ্‌লো। মনে ক'র্‌লো সে বেড়েই চ'ল্‌বে—এমন সময়ে ছন্দের অমিল ঘোচাবার জন্যে হঠাৎ এক-মুহূর্ত্তেই মায়ের প্রলয় অনুচর এসে হাজির। এখন কান্না, আর বক্ষে করাঘাত। ইতি ১৬ই আশ্বিন, ১৩২৫।

২২

শান্তিনিকেতন

মাদ্রাজের দিকে যে-দিন যাত্রা ক'রেছিলুম সে-দিন শনিবার এবং সপ্তমী, অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই মতো দিনক্ষণের বিদ্যা আমার জানা নেই। ব'ল্‌তে পারিনে আমার যাত্রার সময় লক্ষকোটি যোজন দূরে গ্রহনক্ষত্রের বিরাট্‌ সভায় আমার এই ক্ষুদ্র মাদ্রাজ ভ্রমণ সম্বন্ধে কী রকম আলোচনা হ'য়েছিলো, কিন্তু তা'র ফলের থেকে বোঝা যাচ্চে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে ঘোরতর মতভেদ হ'য়েছিলো। সেই জন্যে আমার ভ্রমণ-পথের হাজার মাইলের মধ্যে ছ-শো মাইল পর্য্যন্ত আমি সবেগে সগর্ব্বে এগোতে পেরেছিলুম। কিন্তু বিরুদ্ধ জ্যোতিষ্কের দল কোমর বেঁধে এম্‌নি অ্যাজিটেশন্‌ ক'র্‌তে লাগ্‌লো-যে, বাকি চারশো মাইলটুকু আর পেরোতে পারা গেল না। জ্যোতিষ্ক-সভায় কেবলমাত্র আমারই যাত্রা সম্বন্ধেই-যে বিচার হ'য়েছিলো তা নয়—বেঙ্গল-নাগপুর রেলোয়ে লাইনের যে-এঞ্জিনটা আমার গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে, মঙ্গল, শনি এবং অন্যান্য ঝগ্‌ড়াটে গ্রহেরা তা'র সম্বন্ধেও প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছিলো—

যদি বলো সে-সভায় তো আমাদের খবরের কাগজের কোনো রিপোর্টার উপস্থিত ছিল না তবে আমি খবর পেলুম কোথা থেকে, তবে তা'র উত্তর হ'চ্চে এই যে, আইনকর্ত্তারা তাঁদের মন্ত্রণা-সভায় কী আইন পাশ ক'রেচেন তা তাঁদের পেয়াদার গুঁতো খেলেই সব চেয়ে পরিষ্কার বোঝা যায়। যে-মুহূর্ত্তে হাওড়া ষ্টেশনে আমার রেলের এঞ্জিন বাঁশি বাজালে, সে-বাঁশির আওয়াজে কত তেজ, কত দর্প। আর রবীন্দ্রনাথ ওরফে ভানুদাদা নামক যে-ব্যক্তি তোরঙ্গ বাক্স ব্যাগ বিছানা গাড়িতে বোঝাই ক'রে তা'র তক্তর উপরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ইলেক্‌ট্রিক্ পাখার চলচ্চক্র-গুঞ্জন-মুখর রথকক্ষে একাধিপত্য বিস্তার ক'র্‌লেন, তা'রই বা কত আশ্বস্ততা। তা'র পরে কত গড়্ গড়্, খড়্ খড়্, ঝর্ ঝর্, ভোঁ ভোঁ, ঢং ঢং, ষ্টেশনে ষ্টেশনে কত হাঁক্-ডাক্, হাঁস্‌ফাঁস্, হন্ হন্, হট্ হট্, আমাদের গাড়ির দক্ষিণে বামে কত মাঠ বাট বন জঙ্গল নদী নালা গ্রাম সহর মন্দির মস্‌জিদ কুটীর ইমারত—যেন বাঘে তাড়া করা গোরুর পালের মতো ঊর্দ্ধশ্বাসে আমাদের বিপরীত দিকে ছুটে পালাতে লাগ্‌লো। এম্‌নি ভাবে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে যখন পিঠাপুরমে পৌছ্‌তে মাঝে কেবল একটা

ষ্টেশন মাত্র আছে, এমন সময় এঞ্জিনটার উপরে নক্ষত্র-সভার অদৃশ্য পেয়াদা তা'র অদৃশ্য পরোয়ানা হাতে নিয়ে নেবে প'ড়্‌লো, আর অম্‌নি কোথায় গেল তা'র চাকার ঘুর্‌নি, তা'র বাঁশির ডাক, তা'র ধূমোদ্গার, তা'র পাথুরে কয়লার ভোজ! পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, বিশ মিনিট যায়, এক ঘণ্টা যায়, ষ্টেশন থেকে গাড়ি আর নড়েই না! সাড়ে পাঁচটায় পিঠাপুরমে পৌঁছ্‌বার কথা কিন্তু সাড়ে ছ-টা, সাড়ে সাতটা বাজে তবু এমনি সমস্ত স্থির হ'য়ে রইলো-যে, "চরাচরমিদং সর্ব্বং"-যে চঞ্চল, এ কথাটা মিথ্যা ব'লে বোধ হ'লো। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ধক্ ধক্ ধুক্ ধুক্ ক'র্‌তে ক'র্‌তে আর একটা এঞ্জিন এসে হাজির। তা'র পরে রাত্রি সাড়ে আট্‌টার সময় আমি যখন পিঠাপুরমে রাজবাড়িতে গিয়ে উঠ্‌লুম তখন আমার মনের অবস্থাটা দেখি ঠিক সেই এঞ্জিনেরই মতো। মনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, "কেমন হে, মাদ্রাজে যাচ্চো তো? সেখান থেকে কাঞ্চি মদ্র অন্ধ্র পৌণ্ড্র প্রভৃতি কত দেশ দেশান্তর দেখ্‌বার আছে, কত মন্দির কত গুহা, কত তীর্থ ইত্যাদি ইত্যাদি",—আমার মন সেই এঞ্জিনটার মতো চুপ ক'রে গম্ভীর হ'য়ে রইলো, সাড়াই

দেয় না। স্পষ্ট বোঝা গেল, দক্ষিণের দিকে সে আর এক পাও বাড়াবে না। মনের সঙ্গে বেঙ্গল-নাগপুরের এঞ্জিনের একটা মস্ত প্রভেদ এই-যে, এঞ্জিন বিগ্‌ড়ে গেলে আর একটা এঞ্জিন টেলিফোন্ ক'রে আনিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু মন বিগ্‌ড়োলে সুবিধামতো আর একটা মন পাই কোথা থেকে? সুতরাং মাদ্রাজ চারশো মাইল দূরে প'ড়ে রইলো আর আমি গতকল্য শনিবার মধ্যাহ্নে সেই হাবড়ায় ফিরে এলুম। যে-শনিবার একদা তা'র কৌতুক-হাস্য গোপন ক'রে আমাকে মাদ্রাজের গাড়িতে চড়িয়ে দিয়েছিলো সেই শনিবারই আর একদিন আমাকে হাওড়ায় নামিয়ে দিয়ে তা'র নিঃশব্দ অট্টহাস্যে মধ্যাহ্ন আকাশ প্রতপ্ত ক'রে তুল্‌লে। এই তো গেল আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। কিন্তু তুমি যখন হিমালয়-যাত্রায় বেরিয়েছিলে তখন নক্ষত্র-সভায় তোমার সম্বন্ধেও তো ভালো রেজো-ল্যূশন্ পাস্ হয়নি। আমরা সবাই স্থির ক'র্‌লুম, গিরিরাজের শুশ্রূষায় তুমি সেরে আস্‌বে। কিন্তু তারাগুলো কেন কুমন্ত্রণা ক'র্‌তে লাগ্‌লো। আমার বিশ্বাস কী জানো, অনেকগুলো ঈর্ষাপরায়ণ তারা আছে, তা'রা তোমার ভানুদাদাকে একেবারেই পছন্দ

করে না। প্রথমত, আমার নামটাই তাদের অসহ্য বোধ হয় এই জন্যে বদ্‌নাম কর্‌বার সুবিধা পেলে ছাড়ে না। তা'রপরে দেখেচে আমার সঙ্গে আকাশের মিতার খুব ভাব আছে সেইজন্যে নক্ষত্রগুলো আমাকে তাদের শত্রুপক্ষ ব'লে ঠিক ক'রেচে। যাই হোক্, আমি ওদের কাছে হার মান্‌বার ছেলে নই। ওরা যা কর্‌বার করুক্, আমি দিনের আলোর দলে রইলুম। তোমাকে কিন্তু কুচক্রী নক্ষত্রগুলোর উপরে টেক্কা দিতে হবে। বেশ শরীরটাকে সেরে নিয়ে, মনটাকে প্রফুল্ল ক'রে হৃদয়টাকে শান্ত করো, জীবনটাকে পূর্ণ করো। তা'রপরে লক্ষ্যকে ঊর্দ্ধে রেখে অপরাজিত চিত্তে সংসারের সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে চ'লে যাও— কল্যাণ লাভ করো এবং কল্যাণ দান করো। নিজের বাসনাকে উদ্দাম ক'রে না তুলে মঙ্গলময়ের শুভ-ইচ্ছাকে নিজের অন্তরে বাহিরে সার্থক করো। ইতি ২০ অক্টোবর, ১৯১৮।

২৩

শান্তিনিকেতন

আমার ভ্রমণ শেষ হ'লো। যেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ ক'রেছিলুম সেইখানেই আবার এসে ফিরেচি।

সকলেই পরামর্শ দিয়ে থাকে, ছুটি পেলেই স্থান এবং বায়ু পরিবর্ত্তন করা দরকার কিন্তু দেখা গেল, সেটা-যে অনাবশ্যক এবং ক্লেশকর—সেইটে ভালো ক'রে বুঝে দেখ্‌বার জন্যেই কেবল পরিবর্ত্তনের দরকার। আসল দরকার, যেখানে আছি সেইখানেই মনটাকে সম্পূর্ণ এবং সচেতন ভাবে ঢেলে দেওয়া। এই-যে মাঠ আমার চোখে প'ড়্‌চে এর কি দেখ্‌বার যোগ্য রস ফুরিয়ে গেচে? আর এই-যে শিশিরার্দ্র সকালবেলাটি তা'র কিরণ-দলের মাঝখানে আমার মনকে মধুপানরত স্তব্ধ ভ্রমরের মতো স্থান দিয়েচে, এ কি কোনোকালে এর বৃন্ত থেকে ঝ'রে প'ড়্‌বে? আসল কথা, মনটা অসাড় হ'লেই তাকে সাড়া দেবার জন্যে নাড়া দিতে হয়। তাই আমাদের সাধনা হওয়া উচিত, কী ক'র্‌লে আমাদের মন অসাড় না হয় তা হ'লেই নিজের মধ্যে নিজের সম্পদ লাভ ক'র্‌তে পারি, কেবলি বাইরের জন্যে ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে হয় না। আমাদের যা-কিছু সবচেয়ে বড়ো সম্পদ, সবচেয়ে বড়ো আনন্দ—তা'র ভাণ্ডার যদি বাইরে থাকে তা হ'লে আমাদের ভারি মুস্কিল, কেন না, বাইরের পথে বাধা ঘ'টবেই, বাইরের দরজা মাঝে মাঝে বন্ধ হবেই। বাইরের কাছ

থেকে ভিক্ষা চাওয়ার অভ্যাস আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের ইচ্ছা বাইরের দিকে বাধা পেলেও আমরা যেন অন্তরের মধ্যে পূর্ণতা অনুভব ক'রে শান্তি পেতে পারি। নইলে, নিজেও অশান্ত হই— চারিদিককেও অশান্ত ক'রে তুলি। এই সংসার থেকে যে-প্রীতি, যে-কল্যাণ আমরা অন্তরের মধ্যে পেয়েচি সেই আমাদের অন্তরতম লাভের জন্যে যেন আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ হই। বাইরের দিকে যে-কিছু জিনিষ পাইনি, সে-দিক থেকে যা-কিছু বাধা আস্‌চে, তা'রই ফর্দ্দটাকে লম্বা ক'রে তুলে যদি খুঁৎখুঁৎ করি, ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে থাকি তা হ'লে অকৃতজ্ঞতা হয় এবং সেই চঞ্চলতা নিতান্তই বৃথা নিজের অন্তর-বাহিরকে আবৃত করে মাত্র। স্থির হবো, প্রশান্ত হবো, মনকে প্রসন্ন রাখবো তা হ'লেই আমাদের মন এমন একটি স্বচ্ছ আকাশে বাস ক'র্‌বে যাতে ক'রে অমৃতলোক থেকে আনন্দ-জ্যোতি আমাদের মনকে স্পর্শ ক'র্‌তে বাধা পাবে না। তোমার প্রতি তোমার ভানুদাদার এই আশীর্ব্বাদ-যে, তুমি আপনার ইচ্ছাকে একান্ত তীব্র ক'রে চিত্তকে কাঙাল-বৃত্তিতে দীক্ষিত ক'রো না—বিধাতার কাছ থেকে যা-কিছু দান পেয়েচো

তাকে অন্তরের মধ্যে নম্র-ভাবে গ্রহণ এবং অবিচলিত-ভাবে রক্ষা ক'রো! শান্তি হ'চ্চে সত্য উপলব্ধি কর্‌বার সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা—সংসারের অনিবার্য্য আঘাতে ব্যাঘাতে, ইচ্ছার অনিবার্য্য নিষ্ফলতায় সেই সুস্নিগ্ধ শান্তি যেন তোমার মধ্যে বিক্ষুব্ধ না হয়। ইতি ১০ই কার্ত্তিক, ১৩২৫।

২৪

শান্তিনিকেতন

এতক্ষণ তুমি রেলগাড়িতে ধক্ ধক্ ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'লেচো, কত ষ্টেশন পার হ'য়ে চ'লে গিয়েচো—আমাদের এই লাল মাটির, এই তালগাছের দেশ হয় তো ছাড়িয়ে গেচো বা। আমার পূবদিকের দরজার সাম্‌নে সেই মাঠে রৌদ্র ধূ ধূ ক'র্‌চে এবং সেই রৌদ্রে নানা রঙের গোরুর পাল চ'রে বেড়াচ্চে। এক-একটা তালগাছ তাদের ঝাঁক্‌ড়া মাথা নিয়ে পাগ্‌লার মতো দাঁড়িয়ে আছে। আজ দিনে আমার সেই বড়ো চৌকিতে বসা হ'লো না—খাওয়ার পর এণ্ডরুজ্ সাহেব এসে আমার সঙ্গে বিদ্যালয়ের ভূত-ভবিষ্যৎ-

বর্ত্তমানসম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা ক'র্‌লেন তাতে অনেকটা সময় চ'লে গেল। তা'রপরে নগেনবাবু নামক এখানকার একজন মাষ্টার তাঁর এক মস্ত তর্জ্জমা নিয়ে আমার কাছে সংশোধন কর্‌বার জন্যে আন্‌লেন, তাতেও অনেকটা সময় চ'লে গেল। সুতরাং বেলা তিনটে বেজে গেচে তবু আমি আমার সেই ডেস্কে ব'সে আছি। বই, কাগজ, খাতা, দোয়াত, কলম, ওষুধের শিশি এবং অন্য হাজার রকম জবড়জঙ্গ্ জিনিসে আমার ডেস্ক পরিপূর্ণ। তা'র মধ্যে এমন অনেক আবর্জ্জনা আছে, যা এখনি টেনে ফেলে দিলেই চলে; কিন্তু কুঁড়ে মানুষের মুস্কিল এই-যে, আবশ্যকের জিনিস সে খুঁজে পায় না আর অনাবশ্যক জিনিস না খুঁজলেও তা'র সঙ্গে লেগেই থাকে। এমন অনেক ছেঁড়া লেফাফা কাগজ চাপা দিয়ে জমানো র'য়েচে যার ভিতরকার চিঠিরই কোনোও উদ্দেশ পাওয়া যায় না। মনে আছে, আমাকে তোমার রূপকথা পাঠিয়ে দিতে হবে সেই অলাবু-নন্দিনীর "কাহিনী" আর সেই "চম্‌কিলা" "সোনেকিতরহ" চুলওয়ালী রাজকুমারীর কথা। তা ছাড়া, আর একটি কথা মনে রাখ্‌তে হবে, মন খারাপ ক'রো না—লক্ষ্মী মেয়ে হ'য়ে প্রসন্ন হাসি

হেসে ঘর উজ্জ্বল ক'রে থাকবে। সকলেই ব'লবে, তুমি এমন সোনেকিতরহ হাসি পেয়েচো কোন্ পারিজাতের গন্ধ থেকে, কোন্ নন্দন-বীণার ঝঙ্কার থেকে, কোন প্রভাত-তারার আলোক থেকে, কোন্ সুর-সুন্দরীর সুখস্বপ্ন থেকে, কোন্ মন্দাকিনীর চলোর্ম্মি-কল্লোল থেকে, কোন্—কিন্তু আর দরকার নেই, এখনকার মতো এই ক-টাতেই চ'লে যাবে—কেন না কাগজ ফুরিয়ে এসেচে, দিনও অবসন্ন-প্রায়, অপরাহ্ণের ক্লান্ত রবির আলোক ম্লান হ'য়ে এসেচে।

২ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

২৫

শান্তিনিকেতন

কাল তোমার চিঠি পেয়েচি, আমার চিঠিও নিশ্চয় তুমি পেয়েচো। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বেশ হাসিমুখে সেই বাংলা মহাভারত এবং চারুপাঠ প'ড়চো। যে তোমাকে দেখচে, সেই মনে ক'রচে—চারুপাঠের মধ্যে খুব মনোহর গল্প এবং তোমার শিশু-মহাভারতের মধ্যে খুব মজার কথা কিছু বুঝি আছে। কিন্তু তা'রা

জানে না, প্রায় দু-শো ক্রোশ তফাৎ থেকে ভানুদাদা তোমাকে খুসি পাঠিয়ে দিচ্চে—এত খুসি-যে, কার সাধ্য তোমাকে বিরক্ত করে, বা রাগায়, বা দুঃখ দেয়। আমি প্রায়সন্ধ্যাবেলায় সেই-যে গান গাই,—"বীণা বাজাও মম অন্তরে" সেই গানটি তোমার মনের মধ্যে বরাবরকার মতো স্বরলিপি ক'রে লিখে রেখে দেবার ইচ্ছা আছে—মনটি গানের সুরে এমনি বোঝাই হ'য়ে থাক্‌বে-যে, বাহিরের তুফানে তোমাকে নাড়া দিতে পার্‌বে না। শুধু তোমাকে ব'ল্‌চিনে, আমারও ভারি ইচ্ছে, নিজের ভরা মনটির মাঝখানে বেশ নিবিষ্ট হ'য়ে ব'সে বাইরের সমস্ত যাওয়া-আসা কাঁদা-হাসার অনেক উপরে স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পারি। আপনার ভিতরে আপনার চেয়ে বড়ো কাউকে যদি ধ'রে রাখা যায় তা হ'লেই সেই ভিতরের গৌরবে বাহিরের ধাক্কাকে একটুও কেয়ার না কর্‌বার শক্তি আপনিই আসে। সেই ভিতরের ধনকে ভিতরে পেয়ে ভিতরে ধ'রে রাখ্‌বার জন্যেই আকাঙ্ক্ষা ক'র্‌চি। বাইরের কাছে যখনই কাঙালপনা ক'র্‌তে যাই তখনই সে পেয়ে বসে, তা'র আর দৌরাত্ম্যের অন্ত থাকে না—সে যতটুকু দেয় তা'র চেয়ে দাবী ঢের বেশি করে—

সে এমন মহাজন-যে, শতকরা পাঁচশো টাকা সুদ আদায় ক'র্‌তে চায়। সে শাইলক্‌, সামান্য টাকা দেয় কিন্তু ছুরি বসিয়ে রক্তে মাংসে তা'র শোধ নেবার দাবী করে। তাই ইচ্ছে করি, বাহিরটাকে ধার দেবো কিন্তু ওর কাছ থেকে সিকি পয়সা ধার নেবো না। এই আমার মৎলবের কথাটা তোমার কাছে ব'লে রাখ্‌লুম। তোমার গণনামতে আমার যখন আটাশ বৎসর বয়স হবে ততদিনে যদি মৎলব সিদ্ধি হয় তা হ'লে বেশ মজা হবে। এখানকার খবর সব ভালো, সাহেব গেচে বাঁকিপুরে, দিনু, কমল এসেচে আমার ঘরের একতলায়, আমি সেই অনুবাদের কাজে ভূতের মতো খাট্‌চি; কিন্তু ভূত-যে খুব বেশি খাটে—এ অখ্যাতি তা'র কেন হ'লো বলো দেখি? কথাটা সত্য হ'লে তো ম'রেও শান্তি নেই।

## ২৬

শান্তিনিকেতন

এখনও আমার কাজের ভিড় কিছুই কমেনি: সবাই মনে করে—আমি কবি মানুষ, দিনরাত্রি আকাশের

দিকে তাকিয়ে মেঘের খেলা দেখি, হাওয়ার গান শুনি, চাঁদের আলোয় ডুব দিই, ফুলের গন্ধে মাতাল হই, পল্লব-মর্ম্মরে থর্ থর্ ক'রে কাঁপি, ভ্রমর-গুঞ্জনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে যাই ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব হ'লো হিংসের কথা। তা'রা জাঁক ক'রে ব'ল্‌তে চায়-যে, তা'রা কবিতা লেখে না বটে কিন্তু হপ্তায় সাতদিন ক'রে আফিসে যায় আদালত করে, খবরের কাগজ চালায়, বক্তৃতা দেয়, ব্যবসা করে, তা'রা এত বড়ো ভয়ঙ্কর কাজের লোক। আফিসের ছুটি নিয়ে তা'রা একবার এসে দেখে যাক্—আমি কাজ করি কিনা। আচ্ছা, তা'রা খুব কাজ ক'র্‌তে পারে—আমি না হয় মেনে নিলুম, কিন্তু খুব কাজ না ক'র্‌তে পারে এমন শক্তি কি তাদের আছে? যেই তাদের হাতে কাজ না থাকে অম্‌নি তা'রা হয় ঘুমোয়, নয় তাস খেলে, নয় মদ খায়, নয় পরের নিন্দে করে, কী ক'রে-যে সময় কাটাবে, ভেবেই পায় না। আমার সুবিধা এই-যে, যখন কাজ থাকে তখন রীতিমতো কাজ করি, আবার, যখন কাজ না থাকে তখন খুব ক'ষে কাজ না ক'র্‌তে পারি—তা'র কাছে কোথায় লাগে তোমার বাবার কমিটি-মীটিং। যখন কাজ না-করার ভিড় পড়ে তখন

তা'র চাপে আমাকে একেবারে রোগা ক'রে দেয়। সম্প্রতি কিন্তু কাজ করাটাই আমার ঘাড়ে চেপেচে, তাই সেই নাটকটা আর এক অক্ষরও লিখ্‌তে পারিনি। এই গোলমালের মধ্যে যদি লিখ্‌তে যাই আর যদি তাতে গান বসাই তবে তা'র ছন্দ আর মিল অনেকটা তোমার শিশু-মহাভারতেরই মতো হ'য়ে উঠ্‌বে। চিঠিতে যে-ছবি এঁকেচো—খুব ভালো হ'য়েচে। মেয়েটিকে দেখে বোধ হ'চ্চে—ওর ইস্কুলে যাবার তাড়া নেই, ঘরকন্নার কাজের ভিড়ও বেশি আছে ব'লে মনে হ'চ্চে না; ওর চুলের সমস্ত কাঁটা রাস্তায় প'ড়ে গেচে, আর "গহনা ওয়ছনা" "চুনারি উনারি"র কোনোও ঠিকানা নেই। "কহু"র ভিতর থেকে-যে "হুল্‌হীন" বেরিয়ে এসেছিলো এ মেয়ে বোধ হয় সে নয়, এর নাম কী লিখে পাঠিয়ো। ইতি ৯ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

২৭

শান্তিনিকেতন

আজকের তোমাকে সব খবরগুলি দেওয়া যাক্‌। অনেক দিন পরে আজ আমার ইস্কুল খুলেচে, আজ

থেকে ইস্কুল-মাষ্টারি ফের সুরু হ'লো। আজ সকালে তিনটে ক্লাস নিয়েচি। কিন্তু ছেলেরা সব আসেনি, খুব কম এসেচে। বোধ হয়, ব্যামোর ভয়ে আস্‌চে না। আমার বৌমা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেচেন, জিজ্ঞাসা ক'রেচো; তিনি পাড়াতেই আছেন। আমি যে-ঘরে থাকি—তা'র সাম্‌নে এক লাল রাস্তা আছে, তা'র ঠিক ওধারেই এক দোতলা ইমারৎ তৈরি হচ্চে—তা'রই একতলা ঘরে তিনি বাস করেন। শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরী তাঁকে অচ্ছী অচ্ছী কাহিনী শুনাতী হৈ, কিন্তু আমি সেটা আন্দাজে ব'ল্‌চি। কিছুকাল থেকে তা'র কণ্ঠস্বরও শুনিনি, তাকে দেখ্‌তেও পাইনি—তাই আশঙ্কা হ'চ্চে সে হয় তো তা'র সেই রূপকথার "কদু"র মধ্যে ঢুকে প'ড়েচে। যাই হোক্, পাড়ার সমস্ত খবর রাখ্‌বার সময় আমি পাইনে, আমি কখনও বা আমার সেই কোণের ডেস্কে কখনও বা সেই লাইব্রেরি ঘরের টেবিলে ঘাড় হেঁট ক'রে কলম চালিয়ে দিনযাপন ক'র্‌চি। সাম্‌নেকার খাতা-পত্রের বাইরে যে-একটি প্রকাণ্ড জগৎ আছে, তা'র প্রতি ভালো ক'রে চোখ তুলে—যে দেখা, সে আর দিনের আলো থাক্‌তে ঘ'টে উঠ্‌চে না। সন্ধ্যার পরে সেই নীচের বারান্দায় খাবার

টেবিলটা ঘিরেই বৈঠক হয়, সেখানে তর্ক হয় বিতর্ক হয় এবং মাঝে মাঝে গানও হ'য়ে থাকে। কারণ—আজকাল ফের আবার তুটি একটি ক'রে গান জ'ম্‌চে। সন্ধ্যার পরে সেই আমার কোণের বিছানায় তাকিয়া ঠেস্‌ দিয়ে কেরোসিনের আলোয় মৃদুমন্দস্বরে খাতা পেন্‌সিল হাতে গান করি আর পশ্চিমের উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে—তুমি ভাব্‌চো সেই বাতায়ন থেকে স্বর্গের অপ্সরীরা আমার গান শুন্‌তে আসেন—ঠিক তা নয়—সেই উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে কীট-পতঙ্গ আস্‌তে থাকে,—তাও যদি তা'রা আমার গান শুনে মুগ্ধ হ'য়ে আস্‌তো তা হ'লেও আমি মনে মনে একটু অহঙ্কার ক'র্‌তে পার্‌তুম,—তা'রা আসে ঐ ডীট্‌জ্‌ লণ্ঠনের কেরোসিন আলোটা লক্ষ্য ক'রে। উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে হঠাৎ এক-একবার—আন্দাজ ক'রে বলো দেখি কী শুন্‌তে পাই? তুমি ভাব্‌চো, নক্ষত্র-লোক থেকে অনাহত বীণার অশ্রুত গীত-ধ্বনি? তা নয়;—এক সঙ্গে ভোঁদা, দানু, টম, রঞ্জু এবং এ মুল্লুকের যত দিশি কুকুরের তুমুল চীৎকার-শব্দ। যদি এরা আমার গান শুনে বাহবা দেবার জন্যে এই আওয়াজ ক'র্‌তো তা হ'লেও বুঝ্‌তুম—কবির গানে চতুষ্পদ জন্তুরা পর্য্যন্ত

মুগ্ধ—কিন্তু তা নয়, তা'রা স্বজাতি আগন্তুকের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ ক'রে স্বর্গ-মর্ত্ত্যকে চঞ্চল ক'রে তোলে—কবির গানে তা'রা কর্ণপাতও করে না। যাই হোক্, ভূতলের কুকুর থেকে আকাশের তারা পর্য্যন্ত সবাই যদিচ উদাসীন তবুও দু'টো একটা ক'রে গান জ'মচে। ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

২৮

শান্তিনিকেতন

আজ দুপুরবেলায় যখন খেতে ব'সেচি, এমন সময় —রোসো, আগে ব'লেনি কী খাচ্ছিলুম—খুব প্রকাণ্ড মোটা একটা রুটি—কিন্তু মনে ক'রো না তা'র সবটাই আমি খাচ্ছিলুম। রুটিটাকে যদি পূর্ণিমার চাঁদ ব'লে ধ'রে নেও তা হ'লে আমার টুক্‌রোটি দ্বিতীয়ার চাঁদের চেয়ে বড়ো হবে না। সেই রুটির সঙ্গে কিছু ডাল ছিল, আর ছিল চাট্‌নি আর একটা তরকারিও ছিল। যা হোক্, ব'সে ব'সে রুটি চিবোচ্চি, এমন সময়—রোসো, আগে ব'লে নিই রুটি, ডাল, চাট্‌নি এলো কোথা থেকে। —তুমি বোধ হয় জানো, আমার এখানে প্রায় পঁচিশজন

গুজরাটি ছেলে আছে—আমাকে খাওয়াবে ব'লে তাদের হঠাৎ ইচ্ছা হ'য়েছিলো। তাই আজ সকালে আমার লেখা সেরে স্নানের ঘরের দিকে যখন চ'লেচি, এমন সময় দেখি, একটি গুজরাটি ছেলে থালা হাতে ক'রে আমার দ্বারে এসে হাজির। যা হোক্, নীচের ঘরে টেবিলে ব'সে ব'সে রুটির টুক্‌রো ভাঙ্‌চি আর খাচ্চি, আর তা'র সঙ্গে একটু একটু চাট্‌নিও মুখে দিচ্চি, এমন সময়—রোসো, আগে ব'লে নিই, খাবার কী রকম হ'য়েছিলো। রুটিটা বেশ শক্ত-গোছের ছিল; যদি আমাকে সম্পূর্ণ চিবিয়ে সবটা খেতে হ'তো তা হ'লে আমার একলার শক্তিতে কুলিয়ে উঠ্‌তো না, মজুর ডাক্‌তে হ'তো। কিন্তু ছিঁড়্‌তে যত শক্ত মুখের মধ্যে ততটা নয়। আবার রুটিটা মিষ্টি ছিল; ডাল তরকারি দিয়ে মিষ্টি রুটি খাওয়া আমাদের আইনে লেখে না, কিন্তু খেয়ে দেখা গেল-যে, খেলে-যে বিশেষ অপরাধ হয় তা নয়। সেই রুটি খাচ্চি, এমন সময়—রোসো, ওর মধ্যে একটা কথা ব'ল্‌তে একেবারেই ভুলে গেচি, ছুটো পাঁপর-ভাজাও ছিল; সে-ছুটো, আমি যাকে ব'লে থাকি সুশ্রাব্য—অর্থাৎ খেতে বেশ ভালো লাগে। শুনে তুমি হয় তো আশ্চর্য্য হবে এবং আমাকে

হয় তো মনে মনে পেটুক ঠাউরে রেখে দেবে—এবং যখন আমি কাশীতে যাবো তখন হয় তো সকালে বিকালে আমাকে চাট্‌নি দিয়ে কেব্‌লি পাঁপর-ভাজা খাওয়াবে। তবু সত্য গোপন ক'র্‌বো না, দুখানা পাঁপর-ভাজা সম্পূর্ণই খেয়েছিলুম। যা হোক্, সেই পাঁপর মচ্ মচ্ শব্দে খাচ্চি, এমন সময়—রোসো, মনে ক'রে দেখি সে-সময়ে কে উপস্থিত ছিল। তুমি ভাব্‌চো, তোমার বউমা তোমার ভানুদাদার পাঁপর-ভাজা খাওয়া দেখে অবাক্ হ'য়ে হতবুদ্ধি হ'য়ে টেবিলের এক কোণে ব'সে মনে মনে ঠাকুর-দেবতার নাম ক'র্‌ছিলেন, তা নয়—তিনি তখন কোথায় আমি জানিনে। আর কমল? সেও-যে তখন কোথায় ব'সে রোদ পোয়াচ্ছিলো তা আমি জানিনে। তা হ'লে দেখ্‌চি টেবিলে আমি এক্‌লা ছাড়া কেউই ছিল না। যাই হো'ক্, দুখানা পাঁপর-ভাজার পরে প্রায় সিকিটুক্‌রো রুটির পৌনে চার আনা যখন শেষ ক'রেচি, এমন সময় —হাঁ, হাঁ, একটা কথা ব'ল্‌তে ভুলে গেচি—আমি লিখেচি খাবাব সময়ে কেউ ছিল না, কথাটা সত্য নয়। ভোঁদা কুকুরটা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে লালায়িত জিহ্বায় চিন্তা ক'র্‌ছিলো-যে, আমি

যদি মানুষ হতুম তা হ'লে সকাল থেকে রাত্তির পর্য্যন্ত ঐ রকম মুচ্‌মুচ্‌ মুচ্‌মুচ্‌ মুচ্‌মুচ্‌ ক'রে কেবলি পাঁপর-ভাজা খেতুম; ইতিহাসও প'ড়্‌তুম না, ভূগোলও প'ড়্‌তুম না—শিশু মহাভারত, চারুপাঠের কোনো ধার ধার্‌তুম না। যা হোক্‌, যখন দুখানা পাঁপর-ভাজা এবং কিছু রুটি ও চাট্‌নি খেয়েচি, এমন সময়—কিন্তু ডালটা খাইনি, সেটা নার্‌কোল দিয়ে এবং অনেকখানি কুয়োর জল দিয়ে তৈরি করেছিলো তাতে ডালের চেয়ে কুয়োর জলের স্বাদটাই বেশি ছিল, আর তরকারিটাও খাইনি —কেন না, আমি মোটের উপর তরকারি প্রভৃতি বড়ো বেশি খাইনে। যাই হোক্‌, যখন রুটি এবং পাঁপর-ভাজা খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়েচে, এমন সময়ে ডাক-হরকরা আমার হাতে কাশীর ছাপমারা একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

২৯

শান্তিনিকেতন

দেরি ক'রে তোমার চিঠির উত্তর দিয়েচি—তুমি আমাকে এত বড়ো অপবাদ দেবে আর আমি তাই

যে নীরবে সহ্য ক'রে যাবো, এতবড়ো কাপুরুষ আমাকে পাওনি। কখ্‌খনো দেরি করিনি,—এ আমি তোমার মুখের সাম্‌নে ব'ল্‌চি। এতে তুমি রাগই করো আর যাই করো। দেরি ক'রিনি, দেরি ক'রিনি, দেরি ক'রিনি,—এই তিনবার খুব চেঁচিয়েই ব'লে রাখ্‌লুম— দেখি, তুমি এর জবাব কী দাও। যত দোষ সব আমার, আর তোমার অগস্ত্যকুণ্ডের পোষ্টমাষ্টারটি বুঝি আটত্রিশটী গুণের আধার? ভালো কথা মনে প'ড়্‌লো, তোমাকে শেষবারে চিঠি লেখার পর আমি খোঁজ নিয়ে শুন্‌লুম—শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরীকে বৌমা বিদায় ক'রে দিয়েচেন। কী অন্যায় দেখো দেখি! তা'র অপরাধটা কী?—না, সে যতটা কাজ করে তা'র চেয়ে কথা কয় বেশি। তাই যদি হয়, তা হ'লে তোমার ভানুদাদার কী হবে বলো তো? আমি তো জন্মকাল থেকে কেবল কথাই ক'য়ে আস্‌চি, তুলসীমঞ্জরী যেটুকু কাজ ক'রেচে—আমি তাও ক'রিনি। বৌমা তাই রেগেমেগে হঠাৎ যদি আমার খোরাকি বন্ধ ক'রে দেন তা হ'লে আমার কী দশা হবে? যাই হোক্‌, এই কথাটা নিয়ে এখন থেকে ভাবনা ক'রে কোনোও লাভ নেই—সময় যখন উপস্থিত হবে তখন তোমাকে

খবর দেওয়া যাবে, আমার যা কপালে থাকে তাই হবে। কিন্তু তোমার গুরুমা তোমাকে যে-ছাঁদে বাংলা-চিঠি লেখাতে চান, আমাকে সেই ছাঁদে লিখ্‌লে চ'ল্‌বে না—তা আমার নামের আগে শুধু না-হয় একটা মাত্র "শ্রী"-ই দেবে কিম্বা "শ্রী" নাই বা দিলে। আমার বিলেত যাবার একটা কথা উঠ্‌চে কিন্তু শুধু কথায় যদি বিলেত যাওয়া যেতো তা হ'লে আমার ভাবনা ছিল না; কথা একলা যদি না জোটাতে পার্‌তুম তা হ'লে তুলসীমঞ্জরীকে ডেকে পাঠাতুম। কিন্তু মুস্কিল হ'চ্চে এই-যে, বিলেত যেতে জাহাজের দরকার করে, যুদ্ধের উৎপাতে সেই জাহাজের সংখ্যা ক'মে গেচে অথচ যাবার লোকের সংখ্যা বেড়ে গেচে—তাই এখন—

"ঘাটে ব'সে আছি আনমনা,
যেতেচে বহিয়া সুসময়।"

এদিকে রোজ আমার একটা ক'রে নতুন গান বেড়েই চ'লেচে। গানের সুবিধা এই-যে তা'র জন্যে জাহাজের দরকার হয় না, কথাতেই অনেকটা কাজ হয়। প্রায় পনেরোটা গান শেষ হ'য়ে গেল। তুমি দেরি ক'রে যদি আসো তা হ'লে ততদিনে এত

গান জ'মে উঠ্‌বে-যে, শুন্‌তে শুন্‌তে তোমার চারুপাঠ তৃতীয়ভাগ আর পড়া হবে না—তোমার শিশু-মহাভারত বৃদ্ধ-মহাভারত হ'য়ে উঠ্‌বে। তুমি হয় তো এম্ এ পাশ করার সময় পাবে না। ইতি ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

৩০

শান্তিনিকেতন

তুমি ভাব্‌চো—মজা কেবল তোমাদেরই হ'য়েচে তাই তোমাদের ইস্কুলের প্রাইজের মজার ফর্দ্দ আমাকে লিখে পাঠিয়েচো, কিন্তু এত সহজে আমাকে হার মানাতে পার্‌চো না। মজা আমাদের এখানেও হয় এবং যথেষ্ট বেশি ক'রেই হয়। আচ্ছা, তোমাদের প্রাইজে কত লোক জ'মেছিলো?—পঞ্চাশ জন? কিন্তু আমাদের এখানে মেলায় অন্ততঃ দশ হাজার লোক তো হ'য়েইছিলো। তুমি লিখেচো, একটি ছোটো মেয়ে তা'র দিদির কাছে গিয়ে খুব চীৎকার ক'রে তোমাদের সভা খুব জমিয়ে তুলেছিলো—আমাদের এখানকার মাঠে যা-চীৎকার হ'য়েছিলো তাতে কত রকমেরই

আওয়াজ মিলেছিলো, তা'র কি সংখ্যা ছিল? ছোটো ছেলের কান্না, বড়োদের হাঁক্‌ডাক, ডুগ্‌ডুগির বাদ্য, গোরুর গাড়ির ক্যাচ্‌কোঁচ্‌, যাত্রার দলের চীৎকার, তুবড়ীবাজির সোঁ সোঁ, পট্‌কার ফুট্‌ফাট্‌, পুলিশ-চৌকিদারের হৈ হৈ,—হাসি, কান্না, গান, চেঁচামেচি, ঝগ্‌ড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। ৭ই পৌষে মাঠে খুব বড়ো হাট ব'সেছিলো—তাতে গালার খেল্‌না, ফলের মোরব্বা, মাটির পুতুল, তেলে-ভাজা ফুলুরি, চিনে-বাদাম ভাজা প্রভৃতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস বিক্রী হ'লো। এক-এক পয়সা দিয়ে ছেলেমেয়েরা সব নাগরদোলায় দুল্‌লো; চাঁদোয়ার নীচে নীলকণ্ঠ মুখুজ্যের কংসবধ যাত্রার পালা গান হ'চ্ছিলো—সেইখানে একেবারে ঠেলাঠেলি ভিড়। তা'রপরে ৯ই পৌষে আমাদের মেয়েরা আবার এক মেলা ক'রেছিলেন—তাতে সিঙারা, আলুর-দমের দোকান ব'সিয়েছিলেন—এক-একটা আলুর-দম এক-এক পয়সায় বিক্রী হ'লো। সুকেশী বউমা চিনে-বাদামের পুতুল গ'ড়েছিলেন, তা'র এক-একটা ছ-আনা দামে বিক্রী হ'য়ে গেল। কমল কাদা দিয়ে একটা ঘর বানিয়েছিলো—তা'র খড়ের চাল, চারিদিকে মাটির

পাঁচিল, আঙিনায় শিব-স্থাপন করা আছে—সেটা কেউ কিন্‌তে চায় না, তাই কমল আমাকে সেটা জোর ক'রে তিন টাকায় বিক্রী ক'রেচে। ভেবে দেখো— কী রকম ভয়ানক মজা! ছোটো মেয়েরা একটুক্‌রো নেকড়া ছিঁড়ে তা'র চারিদিকে পাড় সেলাই ক'রে আমার কাছে এনে ব'ল্লে, "এটা রুমাল, এর দাম আটআনা, আপনাকে নিতেই হবে"—ব'লে সেটা আমার পকেটে পুরে দিলে—এমন ভয়ানক মজা! ওদের বাজারে এইরকম শ্রেণীর সব ভয়ানক মজা হ'য়ে গেচে—তোমরা যে-সব প্রাইজ পেয়েচো, সে এর কাছে কোথায় লাগে! তা'রপরে মজা,—মেলা যখন ভেঙে গেল, সমস্ত রাত ধ'রে চেঁচাতে চেঁচাতে বেসুরো গান গাইতে গাইতে দলে দলে লোক ঠিক আমার শোবার ঘরের সাম্‌নের রাস্তা দিয়েই যেতে লাগ্‌লো—মজায় একটুও ঘুম হ'লো না—নীচে যতগুলো কুকুর ছিল, সবাই মিলে ঊর্দ্ধশ্বাসে চেঁচাতে লাগ্‌লো, এমন মজা! তা'রপরে ক'ল্‌কাতার অনেক মেয়ে তাঁদের ছোটো ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছিলেন— তাঁদের কারো কাশী, কারো জ্বর। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রাইজে এমন ধুমধাম, গোলমাল, কাশী-সর্দ্দি, অসুখ-

বিমুখ আটআনায় রুমাল বেচা প্রভৃতি হয়নি—অতএব আমারই জিৎ রইলো।

৩১

শান্তিনিকেতন।

নাঃ, তোমার সঙ্গে পার্‌লুম না—হার মান্‌লুম। তুমি-যে ইস্কুলে যেতে যেতে একেবারে রাস্তার মাঝখানে গাড়ি সুদ্ধ, একগাড়ি মেয়ে সুদ্ধ, তোমাদের মোটা দিদিমণি সুদ্ধ একেবারে উল্টে কাৎ হ'য়ে প'ড়্‌বে,—এত বড়ো ভয়ঙ্কর মজা ক'রবে, এ কী ক'রে জান্‌বো, বলো? তা'রপরে আর-এক ভদ্রলোককে বেচারার একা-গাড়ি থেকে নামিয়ে তা'র গাড়িতে চ'ড়ে ব'স্‌বে; এত মজাতেও সন্তুষ্ট নও, আবার এক-পাটি জুতো রাস্তার মাঝখানে ফেলে আস্‌বে আর সেই জুতোর পিছনে কাশীবাসী ভদ্রলোকটিকে দৌড় করাবে—তারো উপরে আবার ইস্কুলে পৌঁচে কান্না—কি মজা! যদি সেই জুতো-শিকারী বেচারা ভদ্রলোকটি কাঁদতো তা হ'লেও বুঝ্‌তুম—কিন্তু তুমি! বিনা ভাড়ায় পরের একাগাড়িতে চ'ড়ে, বিনা আয়াসে পরকে

দিয়ে হারানো চটিজুতো খুঁজিয়ে নিয়ে—তা'রপরে কিনা কান্না! একেই না বলে লঙ্কাকাণ্ডের পরেও আবার উত্তরকাণ্ড! তুমি লিখেচো, আমিও যদি তোমাদের গাড়ির মধ্যে থাক্‌তুম আর হাত, পা, মাথা, বুদ্ধি-সুদ্ধি সমস্ত একেবারে উল্টে-পাল্টে যেতো তা হ'লে তোমাদের মতোই বাবারে ম'র্‌লুমরে ক'বে চীৎকার ক'র্‌তুম। এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার ক'র্‌বো না—নিশ্চয়ই পা দুটো উপরে আর মাথাটা নীচে ক'রে আমি তানা-নানা শব্দে কানাড়া রাগিণীতে গান ধ'র্‌তুম।

হায়রে হায়, সারে গামা পাধা নিসা!

( আমার ) গাড়ির হ'লো উল্টো মতি,

কোথায় হবে আমার গতি—

খুঁজে আমি না পাই দিশা!

সারে গামা পাধা নিসা!

যখন কাশীতে যাবো, আমার গাড়িটা উল্টে দিয়ে বরঞ্চ পরীক্ষা ক'রে দেখো। ইস্কুলে গিয়ে কাঁদ্‌বো না, তোমার মাথার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে তান লাগিয়ে দেবো—

যদিও আঘাত গায়ে লাগেনি

তবুও করুণ সুরে,

দেবো আমি গান জুড়ে'
ঝাঁপতালে ভৈরবী রাগিণী।
শোনো সবে দিদিমণি, মামা,
সারে সারে সারে গারে গামা!

এই তো গেল মজার কথা! এইবার কাজের কথা। পরশু চল্লুম মৈসুরে, মাদ্রাজে, মাদুরায় এবং মদনাপল্লীতে। ফির্‌তে বোধ হয় জানুয়ারি কাবার হ'য়ে ফেব্রুয়ারি স্থরু হবে—ইতিমধ্যে ঐ দুটো গানের স্থর বসিয়ে এস্‌রাজে অভ্যাস ক'রে নিয়ো। আবার যদি বিশ্বেশ্বরের গোরু, গাড়ি উল্টে দিয়ে নন্দী-ভৃঙ্গীর গোয়ালের দিকে দৌড় মারে তা হ'লে পথের মাঝখানে কাজে লাগাতে পার্‌বে। আর যে-ব্যক্তি তোমার একপাটি চটিজুতো নিয়ে আস্‌বে তাকে উচ্চৈঃস্বরে তানে, মানে, লয়ে চমৎকৃত ক'রে দিতে পার্‌বে। ততদিন কিন্তু ডাকঘরের পালা বন্ধ। আমার চিঠি ফুরোলো, নটে শাকটি মুড়োলো ইত্যাদি। ১৯শে পৌষ, ১৩২৫।

৩২

শান্তিনিকেতন

তোমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এইমাত্র পাওয়া গেল। আমি ভাব্‌চি, তোমার এমন চিঠির বেশ সমান ওজনের জবাবটি দিই কী ক'রে? তুমি চলিষ্ণু, আমি স্তব্ধ; তুমি আকাশের পাখী, আমি বনান্তের অশথগাছ; কাজেই তোমার গানে আর আমার মর্ম্মরে ঠিক সমকক্ষ হ'তে পারে না। এক জায়গায় তোমার সঙ্গে আমার মিলেচে; তুমিও গেচো হাওয়া বদল ক'র্‌তে, আমিও এসেচি হাওয়া বদল ক'র্‌তে। তুমি গেচো কাশী থেকে সোলনে, আমি এসেচি আমার লেখ্‌বার ডেস্ক থেকে আমার জান্‌লার ধারের লম্বা কেদারায়। খুব বদল,—তোমাদের বিশ্বেশ্বরের মন্দির থেকে আর তাঁর শ্বশুরবাড়ি যত বদল তা'র চেয়ে অনেক বেশি। আমি যে-হাওয়ায় ছিলুম, এ হাওয়া তা'র থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ। তবে কিনা, তোমার ভ্রমণে আমার ভ্রমণে একটি মূলগত প্রভেদ আছে, তুমি নিজে চ'লে চ'লে ভ্রমণ ক'র্‌চো কিন্তু আমি নিজে থাকি স্থির আর আমার সাম্‌নে যা-কিছু চ'ল্‌চে, তাদের চলায় আমার

চলা। এই হ'চ্চে রাজার উপযুক্ত ভ্রমণ—অর্থাৎ আমার হ'য়ে অন্যে ভ্রমণ ক'র্‌চে, চল্‌বার জন্যে আমার নিজেকে চ'ল্‌তে হ'চ্চে না। ঐ দেখো না, আজ রবিবার হাটবার, সাম্‌নে দিয়ে গোরুর গাড়ি চ'লেচে—আমার দুই চক্ষু সেই গোরুর গাড়িতে সওয়ার হ'য়ে ব'স্‌লো। ঐ চ'লেচে সাঁওতালের মেয়েরা মাথায় খড়ের আঁটি, ঐ চ'লেচে মোষের দল তাড়িয়ে সন্তোষ বাবুর গোষ্ঠের রাখাল। ঐ চ'লেচে ইষ্টেশনের দিক থেকে গোয়াল-পাড়ার দিকে কা'রা এবং কিসের জন্যে—তা কিছুই জানিনে; একজনের হাতে ঝুল্‌চে এক থেলোহুঁকো, একজনের মাথায় ছেঁড়া ছাতি, একজনের কাঁধে চ'ড়ে ব'সেচে একটা উলঙ্গ ছেলে। ঐ আস্‌চে ভুবনডাঙ্গার গ্রাম থেকে কলসী-কাঁখে মেয়ের দল, তা'রা শান্তি-নিকেতনের কুয়ো থেকে জল নিয়ে যাবে। ঐ সব চলার স্রোতের মধ্যে আমার মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে আমি চুপ ক'রে ব'সে আছি। আকাশ দিয়ে মেঘ চ'লেচে, কাল রাত্রিবেলাকার ঝড়-বৃষ্টির ভগ্ন-পাইকের দল—অত্যন্ত ছেঁড়া খোঁড়া রকমের চেহারা।

এরাই দেখ্‌বো আজ সন্ধ্যেবেলায় নীল, লাল, সোনালি, বেগনি, উর্দ্দি প'রে কালবৈশাখীর নকিবের

মতো গুরু গুরু দামামা বাজাতে বাজাতে উত্তর-পশ্চিম থেকে কুচ্-কাওয়াজ ক'রে আস্‌তে থাক্‌বে—তখন আর এমনতর ভালোমানুষি চেহারা থাক্‌বে না।

আমাদের বিদ্যালয় বন্ধ, এখন আশ্রমে যা-কিছু আসর জমিয়ে রেখেচে শালিখ-পাখীর দল, আরো অনেক রকমের পাখী জুটেচে—বটের ফল পেকেচে তাই সব অনাহূতের দল জমেচে। বনলক্ষ্মী হাসিমুখে সবার জন্যেই পাত পেড়ে দিয়েচেন। ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬।

৩৩

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠিতে যে-রকম ঠাণ্ডা এবং মেঘ্‌লা দিনের বর্ণনা ক'রেচো তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে, তুমি তোমার ভানুদাদার এলাকার অনেক তফাতে চ'লে গেচো। বেশি না হোক, অন্তত দু-তিন ডিগ্রির মতোও ঠাণ্ডা যদি ডাকযোগে এখানে পাঠাতে পারো তা হ'লে তোমাদেরও আরাম, আমাদেরও আরাম। বেয়ারিং পোষ্টে পাঠালেও আপত্তি ক'র্‌বো না, এমন কি ভ্যালু-

পেবলেও রাজি আছি। আসল কথা, ক-দিন থেকে এখানে রীতিমতো খোট্টাই ফেশানের গরম প'ড়েচে। সমস্ত আকাশটা যেন তৃষ্ণার্ত্ত কুকুরের মতো জিব বের ক'রে হাঃ-হাঃ ক'রে হাঁপাচ্চে। আর এই-যে দুপুর-বেলাকার হাওয়া, এ-যে কী রকম—সে তোমাকে বেশি বোঝাতে হবে না—এই ব'ল্‌লেই বুঝ্‌বে-যে, এ প্রায় বেনারসি হাওয়া, আগুনের লক্‌লকে জরির সূতো দিয়ে আগাগোড়া ঠাস বুনোনি;—দিক-লক্ষ্মীরা প'রেচেন, তাঁরা দেবতার মেয়ে ব'লেই সইতে পারেন, কিন্তু ওর আঁচ্‌লা যখন মাঝে মাঝে উড়ে আমাদের গায়ে এসে পড়ে তখন নিজেকে মর্ত্ত্যের ছেলে ব'লেই খুব বুঝ্‌তে পারি। আমি কিন্তু আমার ঐ আকাশের ভানুদাদার দূতগুলিকে ভয় করিনে; এই দুপুরে দেখ্‌বে, ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ কিন্তু আমার ঘরের সব দরজা-জান্‌লা খোলা। তপ্ত হাওয়া হু-হু ক'রে ঘরে ঢুকে আমাকে আগাগোড়া ঘ্রাণ ক'রে যাচ্চে,—এমনি তা'র ঘ্রাণ-যে, ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং। গরমের ঝাঁজে আকাশ ঝাপ্‌সা হ'য়ে আছে—কেমন যেন ঘোলা নীল—ঠিক যেন মূর্চ্ছিত মানুষের ঘোলা চোখ্‌টার মতো। সকলেই থেকে থেকে ব'লে ব'লে উঠ্‌চে, "উঃ, আঃ,—কী গরম!" আমি

তাতে আপত্তি ক'রে ব'ল্‌চি, গরম তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তা'র সঙ্গে আবার ওই তোমার উঃ আঃ জুড়ে দিলে কেন? যাই হোক্, আকাশের এই প্রতাপ আমি এক-রকম ক'রে সইতে পারি কিন্তু মর্ত্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবে আছো, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে। ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমেছিলো তাই অনেক মার খেতে হ'চ্চে। মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হ'য়ে উঠেচে। তাই কতশত বৎসর ধ'রে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইচে কিন্তু আজও শিক্ষা শেষ হয়নি। ইতি, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।

৩৪

কলিকাতা

মাঝে তোমার একটা চিঠির জবাব দিতে পারিনি, ক'ল্‌কাতায় এসেচি। কেন এসেচি, হয় তো খবরের কাগজ থেকে ইতিমধ্যে কতকটা জান্‌তে পার্‌বে। তবু একটু খোলসা ক'রে বলি। তোমার লেফাফায়

তুমি যখন আমার ঠিকানা লেখো, আমি ভাব্লুম ঐ পদবীটা তোমার পছন্দ নয়। তাই ক'ল্‌কাতায় এসে বড়োলাটকে চিঠি লিখেচি—আমার ঐ ছার পদবীটা ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু চিঠিতে আসল কারণটা দিইনি—তোমার নামের একটুও উল্লেখ করিনি। বানিয়ে বানিয়ে অন্য নানাকথা লিখেচি। আমি ব'লেচি, বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জ'মে উঠেছিলো, তা'রই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠেচে—তাই ভারের উপরে আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন ক'র্তে পার্‌চিনে; তাই ওটা মাথার উপর থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা ক'র্‌চি। যাক্‌, এ সব কথা আর ব'ল্‌তে ইচ্ছা করে না—আবার অন্য কথাও ভাব্‌তে পারিনে।

১লা জুন, ১৯১৯।

৩৫

শান্তিনিকেতন

কাল ছিলুম ক'ল্‌কাতায়, আজ বোলপুরে। এসে দেখি, তোমার একখানি চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে। আর দেখি, আকাশে ঘন ঘোর মেঘ,—

বর্ষার আয়োজন সমস্তই র'য়েচে কেবল আমি আসিনি ব'লেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়নি। বর্ষার মেঘের ইচ্ছা ছিল, আমাকে তা'র কাজরী গান শুনিয়ে দেবে—তা'রপরে আমিও তাকে আমার গানে জবাব দেবো। তাই এতক্ষণ পরে আমি দুপুরবেলায় যখন খেয়ে এসে ব'স্‌লুম তখন বৃষ্টি সুরু ক'রে দিয়েচে এক মাঠ থেকে আর-এক মাঠে। আর তা'র কল-সঙ্গীতে আকাশে কোথাও যেন ফাঁক রইলো না। নববর্ষার জল-স্থলের আনন্দ-উৎসব দেখ্‌তে চাও তা হ'লে এসো আমাদের মাঠের ধারে, বসো এই জান্‌লাটিতে চুপ ক'রে। পাহাড়ে বর্ষার চেহারা স্পষ্ট দেখ্‌বার জো নেই, সেখানে পাহাড়েতে মেঘেতে ঘেঁষাঘেঁষি মেশামেশি একাকার কাণ্ড। সমস্ত আকাশটা বুজে যায়; সৃষ্টিটা যেন সর্দ্দিতে, কাশীতে জবুস্থবু হ'য়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে প'ড়ে থাকে। পাহাড় আমার কেন ভালো লাগে না বলি,—সেখানে গেলে মনে হয়, আকাশটাকে যেন আড়-কোলা ক'রে ধ'রে একদল পাহারাওয়ালার হাতে জিম্মা ক'রে দেওয়া হ'য়েচে, সে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আমরা মর্ত্ত্যবাসী মানুষ—সীমাহীন আকাশে আমরা মুক্তির রূপটী দেখ্‌তে পাই—সেই

আকাশটাকেই যদি তোমার হিমালয় পাহাড় একপাল মহিষের মতো শিং গুঁতিয়ে মার্‌তে চায় তা হ'লে সেটা আমি সইতে পারিনে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত,—সেই জন্যে বাংলাদেশের বড়ো বড়ো দিল্‌-দরাজ্ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে তা'র কাছে আমার গানের গলা সেধে এসেচি, এই কারণেই দূর হ'তে তোমাদের সোলন পর্ব্বতকে নমস্কার করি। যা হোক্, বর্ষা বিদায় হবার পূর্ব্বেই তোমরা আমার প্রান্তরে আতিথ্য নেবে শুনে আমি খুসি হ'য়েচি। তোমাদের জন্যে কিছু গান সংগ্রহ ক'রে রাখ্‌বো,—আর পাকা জাম, আর কেয়াফুল, আর পদ্মবন থেকে শ্বেতপদ্ম, আর যদি পারি গোটা কতক আষাঢ়ে গল্প। অতএব খুব বেশি দেরি ক'রো না, পর্ব্বত থেকে ঝর্‌ণা যেমন নেমে আসে তেমনি দ্রুতপদে নেমে এসো। ইতি—আষাঢ়স্য তৃতীয় দিবসে, ১৩২৬।

৩৬

শান্তিনিকেতন

তোমার আজকের চিঠি পেয়ে বড়ো লজ্জা পেলুম। কেন ব'ল্‌বো? এর আগে তোমার একখানি চিঠি

পেয়েছিলুম—তা'র জবাব দেবো-দেবো ক'র্‌চি, এমন সময় তোমার এই চিঠি, আজ তোমার কাছে আমার হার মান্‌তে হ'লো। আমি এত বড়ো লেখক, বড়ো বড়ো পাঁচ ভলুম কাব্যগ্রন্থ লিখেচি,—এহেন-যে আমি —যার উপাধিসমেত নাম হওয়া উচিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ শর্ম্মা রচনা-লবণাম্বুধি কিম্বা সাহিত্য-অজগর কিম্বা বাগক্ষৌহিণীনায়ক কিম্বা রচনা-মহামহোপদ্রব কিম্বা কাব্যকলাকল্পদ্রুম কিম্বা—ফস্‌ ক'রে এখন মনে প'ড়্‌চে না, পরে ভেবে ব'ল্‌বো—একরত্তি মেয়ে, "সাতাশ" বছর বয়স লাভ ক'র্‌তে যাকে অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বছর সাধনা ক'র্‌তে হবে, তা'রই কাছে পরাভব—Two goals to nil! তা'রপরে আবার তুমি যে-সব বিপজ্জনক ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখ্‌চো, আমার এই ডেস্কে ব'সে তা'র সঙ্গে পাল্লা দিই কী ক'রে? আজ সকালে তাই ভাব্‌ছিলুম, পারুলবনের সাম্‌নে দিয়ে যে-রেলের রাস্তা আছে সেখানে গিয়ে রাত্রে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো—তা'রপরে বুকের উপর দিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেন্‌টা চ'লে গেলে পর যদি তখনো হাত চলে তা হ'লে সেই মুহূর্ত্তে সেইখানে ব'সে তোমাকে যদি চিঠি লিখ্‌তে পারি তবে তোমাকে টেক্কা দিতে পার্‌বো। এ সম্বন্ধে

এখনো বউমার সঙ্গে পরামর্শ করিনি, এণ্ড্রুজ্ সাহেবকেও জানাইনি। আমার কেমন মনে মনে সন্দেহ হ'চ্চে, ওঁরা হয়তো কেউ সম্মতি দেবেন না, তা ছাড়া আমার নিজের মনেও একটা কেমন ধোঁকা লাগ্চে; মনে হ'চ্চে যদি গাড়িটার চাপে বুড়ো আঙুলটা কিছু জখম করে তা হ'লে হয় তো লেখা ঘ'টেই উঠ্বে না। আর যদি না ঘটে তা হ'লে অনন্ত-কালের মতো ঐ দু-খানা চিঠির জিৎ তোমার র'য়েই যাবে, অতএব থাক্!

অল্পদিনের মধ্যে আমাদের এখানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার একটাও ঘটেনি। ঝড়-বৃষ্টি অল্প স্বল্প হ'য়েচে কিন্তু তাতে আমাদের বাড়ির ছাদ ভাঙেনি, আমাদের কারো মাথায়-যে সামান্য একটা বজ্র প'ড়্বে তাও প'ড়্লো না। বন্দুক নিয়ে, ছোরাছুরি নিয়ে দেশের নানা জায়গায় ডাকাতি হ'চ্চে; কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট এমনি মন্দ-যে, আজ পর্য্যন্ত অবজ্ঞা ক'রে আমাদের আশ্রমে তা'রা কিম্বা তাদের দূর-সম্পর্কের কেউ পদার্পণ ক'র্লে না। না, না, ভুল ব'ল্চি। একটা রোমহর্ষণ ঘটনা অল্পদিন হ'লো ঘ'টেচে। সেটা বলি। আমাদের আশ্রমের সাম্নে দিয়ে নির্জ্জন প্রান্তরের প্রান্ত বেয়ে একটি দীর্ঘ

পথ বোলপুর-ষ্টেশন পর্য্যন্ত চ'লে গেচে। সেই পথের পশ্চিমে একটি দোতলা ইমারত। সেই ইমারতের একতলায় একটি বঙ্গ-রমণী একাকিনী বাস করেন। সঙ্গে কেবল কয়েকটি দাসদাসী, বেহারা, গোয়ালা, পাচক-ব্রাহ্মণ এবং উপরের তলায় এণ্ড্রুজ্ সাহেব নামক একটি ইংরেজ থাকেন। সমস্ত বাড়িটাতে এ ছাড়া আর জন-প্রাণী নেই। সেদিন মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি, মেঘের আড়াল থেকে চন্দ্র ম্লান কিরণ বিকীর্ণ ক'র্‌চেন। এমন সময় রাত্রি যখন সাড়ে এগারোটা, যখন কেবলমাত্র দশবারো জন লোক নিয়ে একাকিনী রমণী বিশ্রাম ক'র্‌চেন, এমন সময়ে ঘরের মধ্যে কে ঐ পুরুষ প্রবেশ ক'র্‌লে? কোন্ অপরিচিত যুবক? কোথায় ওর বাড়ি, কী ওর অভিসন্ধি? হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ নিদ্রিত ঘরের নিঃশব্দতা সচকিত ক'রে তুলে সে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে,—"ইস্কুল কোথায়?" অকস্মাৎ জাগরণে উক্ত রমণীর ঘন ঘন হৃৎ-কম্প হ'তে লাগ্‌লো; রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে ব'ল্‌লেন, "ইস্কুল ঐ পশ্চিম দিকে।" তখন যুবক জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "হেড্‌মাষ্টারের ঘর কোথায়?" রমণী ব'ল্‌লেন, "জানিনে।"

তা'রপরে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ঐ যুবক সেই ম্লান

জ্যোৎস্নালোকে সেই ঝিল্লি-মুখরিত মধ্যরাত্রে আবার আশ্রমের কঙ্কর-বিকীর্ণ পথে আশ্রম কুক্কুরবৃন্দের তার-তিরস্কার শব্দ উপেক্ষা ক'রে দ্বিতীয় একটি নিঃসহায়া অবলার গৃহের মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌লে। সেই ঘরে তৎকালে উক্ত রমণীর পূর্ণবয়স্ক একটি স্বামীমাত্র ছিল, আর জন-প্রাণীও না। সেখানেও পূর্ব্ববৎ সেই দুটি মাত্র প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের শব্দে স্তিমিত-দীপালোকিত সেই নির্জ্জনপ্রায় কক্ষটি আতঙ্কে নিস্তব্ধ হ'য়ে রইলো। লোকটা বহুদূর দেশ থেকে হেড্ মাষ্টারকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে কেন এখানে এলো? তা'র সঙ্গে কিসের শত্রুতা? সেই রাত্রে স্বামীসনাথা ঐ একটি রমণী এবং স্বামীদূরগতা অন্য অবলা না জানি তাদের সরল কোমল হৃদয়ে কী আশঙ্কা বহন ক'রে ঘুমিয়ে প'ড়্‌লো! পরদিন প্রভাতে হেড-মাষ্টারের মাষ্টার বাদ দিয়ে বাকি ছিন্ন অংশ কি. কোথাও পাওয়া যাবে—তাঁরা আশঙ্কা ক'রেছিলেন?

তা'রপরে তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পরদিন প্রথমা নারীটি আমাকে ব'ল্‌লেন, "তাত, মধ্যরাত্রে একটি যুবক—ইত্যাদি।" শুনে আমার পাঠিকা বিস্মিতা হবেন না-যে, আমি আশ্রম ছেড়ে পালাইনি; এমন কি, আমি

তরবারিও কোষোন্মুক্ত ক'র্লুম না। কর্বার ইচ্ছে থাক্লেও তরবারি ছিল না, থাক্বার মধ্যে একটা কাগজ-কাটা ছুরি ছিল। সঙ্গে কোনো পদাতিক বা অশ্বারোহী না নিয়েই আমি সন্ধান ক'র্তে বেরোলুম, কোন্ অপরিচিত যুবা কাল নিশীথে "হেড্মাষ্টার কোথায়" ব'লে অবলা রমণীর নিদ্রা ভঙ্গ ক'রেচে?

তা'রপরে উপসংহার। যুবককে দেখা গেল, তাকে প্রশ্ন করা গেল। উত্তরে জানা গেল—এখানে তা'র কোনো একটি আত্মীয়-বালককে সে ভর্ত্তি ক'রে দিতে চায়। ইতি সমাপ্ত। ২৬ আষাঢ়, ১৩২৬।

৩০

আমার জ্যোতিষ্ক-মিতাটি আকাশ নইলে বিচরণ ক'র্তে পারেন না—তাঁরি নামধারী আমি অবকাশ নইলে টিক্তে পারিনে। আমার যদি কোনো আলো থাকে তবে সেই আলো প্রচুর অবকাশের মধ্যেই প্রকাশ পায়; সেই জন্যেই আমি ছুটির দরবার করি—কেন না, ছুটিতেই আমার যথার্থ কাজ। তাই লোক-সমাগম দেখে আমি আশ্রম ছেড়ে দৌড় দিয়েচি।

অথচ এই সময়ই উজ্জ্বল সূর্য্যের আলোয়, রঙীন মেঘের ঘটায়, ঘাসে ঘাসে মেঠো ফুলের প্রাচুর্য্যে, হাওয়ায় হাওয়ায় দিকে দিকে কাশ-মঞ্জরীর উল্লাস-হাস্য-হিল্লোলে আশ্রম খুব রমণীয় হ'য়ে উঠেছিলো। ষ্টেশনের দিকে যখন গাড়ি চ'লেছিলো তখন পিছনের দিকে মন টান্‌ছিলো। কিন্তু ষ্টেশনে ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজ্‌লো আর রেলগাড়িটা আমাদের আশ্রমকে যেন টিট্‌কারী দিয়ে পোঁ ক'রে বাঁশি বাজিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চ'লে এলো। রাত এগারোটায় হাওড়ায় উপস্থিত। এসে শুনি, হাওড়ার ব্রিজ্‌ খুলে দিয়েচে। নৌকায় গঙ্গা পার হ'তে হবে। মালপত্র ঘাড়ে নিয়ে ঘাটে গেলেম। সবে জোয়ার এসেচে—ডিঙ্গি নৌকো ঘাট থেকে একটু তফাতে। একটা মাল্লা এসে আমাকে আড়কোলা ক'রে তুলে নিয়ে চ'ল্‌লো। নৌকোর কাছাকাছি এসে আমাকে সুদ্ধ ঝপাস্‌ ক'রে প'ড়ে গেল। আমার সেই ঝোলা-কাপড় নিয়ে সেইখানে জলে কাদায় লুটোপুটি ব্যাপার। গঙ্গামৃত্তিকায় লিপ্ত এবং গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হ'য়ে নিশীথ রাত্রে বাড়ি এসে পৌঁচানো গেল। গঙ্গাতীরে বাস তবু ইচ্ছে ক'রে বহুকাল গঙ্গাস্নান করিনি—ভীষ্ম-জননী ভাগীরথী সেই রাত্রে তা'র শোধ

তুল্‌লেন। আজ বিকেলের গাড়িতে শিলং-পাহাড় যাত্রা ক'র্‌বো; আশা করি এবারকার যাত্রাটা গতবারের গঙ্গাযাত্রার মতো হবে না। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি স্নুরু হ'য়েচে আর ঘন মেঘের আবরণে দিগঙ্গনার মুখ অবগুণ্ঠিত। পূর্ণিমা আশ্বিন, ১৩২৬।

২৮

ব্রুক্‌সাইড্‌
শিলং

কাল এসে পৌঁচেচি শিলং-পর্ব্বতে, পথে কত-যে বিঘ্ন ঘ'ট্‌লো তা'র ঠিক নেই। মনে আছে—বোলপুর থেকে আসবার সময় মা-গঙ্গা আমাকে জল-কাদার মধ্যে হিঁচ্‌ড়ে এনে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন? কিন্তু মান্‌লুম না, বৃহস্পতিবারের বারবেলায় কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথিতে রেলে চ'ড়ে ব'স্‌লুম। দুদিন আগে রথী আমাদের একখানা মোটরগাড়ি গৌহাটি-ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ইচ্ছা ছিল—সেই গাড়িতে ক'রে পাহাড়ে চ'ড়্‌বো। সঙ্গে আমাদের আছেন দিনুবাবু এবং কমলবোঠান, এবং আছেন সাধুচরণ, এবং আছে

বাক্স তোরঙ্গ নানা আকার ও আয়তনের এবং সঙ্গে সঙ্গে চ'লেচেন আমাদের ভাগ্যদেবতা; তাঁকে টিকিট কিন্‌তে হয়নি। সান্তাহার ষ্টেশনে আসাম মেলে চ'ড়্‌লুম, এম্‌নি ক'সে ঝাঁকানি দিতে লাগ্‌লো-যে, দেহের রস-রক্ত যদি হ'তো দই, তা হ'লে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রাণটা তা'র থেকে মাখন হ'য়ে ছেড়ে বেরিয়ে আস্‌তো। অর্দ্ধেক রাত্রে বজ্রনাদ সহকারে মুষল-ধারে বৃষ্টি হ'তে লাগ্‌লো। গৌহাটির নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে যখন খেয়া-জাহাজে ব্রহ্মপুত্রে ওঠা গেল তখন আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন কিন্তু বৃষ্টি নেই। ওপারে গিয়েই মোটরগাড়িতে চ'ড়্‌বো ব'লে খেয়ে-দেয়ে সেজে-গুজে গুছিয়ে-গাছিয়ে ব'সে আছি—গিয়ে শুনি, ব্রহ্মপুত্রে বন্যা এসেচে ব'লে এখনো ঘাটে মোটর নামাতে পারেনি। এদিকে বলে, দুটোর পরে মোটর ছাড়্‌তে দেয় না। অনেক বকাবকি দাপাদাপি ছুটোছুটি হাঁক্‌ডাক ক'রে বেলা আড়াইটের সময় গাড়ি এলো। কিন্তু সময় গেল। তীরের কাছে একটা শূন্য জাহাজ বাঁধা ছিল, সেইটেতে উঠে মুটের সাহায্যে কয়েক বাল্‌তি ব্রহ্মপুত্রের জল তুলিয়ে আনা গেল;—স্নান কর্‌বার ইচ্ছা। ভূগোলে পড়া গেচে—পৃথিবীর তিন

ভাগ জল এক ভাগ স্থল, কিন্তু বন্যার ব্রহ্মপুত্রের ঘোলা স্রোতে সেদিন তিনভাগ স্থল একভাগ জল। তাতে দেহ স্নিগ্ধ হ'লো বটে কিন্তু নির্ম্মল হ'লো ব'ল্‌তে পারিনে। বোলপুর থেকে রাত্রি এগারোটার সময় হাওড়ার তীরে কাদার মধ্যে প'ড়ে যেমন গঙ্গাস্নান হ'য়েছিলো, সেদিন ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নানটাও তেম্‌নি পঙ্কিল। তা হোক্, এবার আমার ভাগ্য আমাকে ঘাড়ে ধ'রে পুণ্যতীর্থোদকে স্নান করিয়ে দিলেন। কোথায় রাত্রি যাপন ক'র্‌তে হবে তারি সন্ধানে আমাদের মোটরে চ'ড়ে গৌহাটি সহরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়া গেল। কিছু দূরে গিয়ে দেখি, আমাদের গাড়িটা হঠাৎ ন যযৌ ন তস্থৌ। বোঝা গেল, আমাদের ভাগ্যদেবতা বিনা অনুমতিতে আমাদের এ গাড়িতেও চ'ড়ে ব'সেচেন, তিনিই আমাদের কলের প্রতি কটাক্ষপাত ক'র্‌তেই সে বিকল হ'য়েচে। অনেক যত্নে যখন তাকে একটা মোটরগাড়ির কারখানায় নিয়ে যাওয়া গেল তখন সূর্য্যদেব অস্তমিত। কারখানার লোকেরা ব'ল্‌লে, "আজ কিছু করা অসম্ভব, কাল চেষ্টা দেখা যাবে।" আমরা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, "রাত্রে আশ্রয় পাই কোথায়?" তা'রা ব'ললে, "ডাকবাংলায়।"

ডাকবাংলায় গিয়ে দেখি, সেখানে লোকের ভিড়—একটিমাত্র ছোটো ঘর খালি, তাতে আমাদের পাঁচ-জনকে পুর্‌লে পঞ্চত্ব সুনিশ্চিত। সেখান থেকে সন্ধান ক'রে অবশেষে গোয়ালন্দগামী ষ্টীমার-ঘাটে একটা জাহাজে আশ্রয় নেওয়া গেল। সেখানে প্রায় সমস্ত রাত বৌমা এবং কমলের ঘোরতর কাশি আর হাঁপানি। রাতটা এই রকম দুঃখে কাট্‌লো। পরদিনে প্রভাতে আকাশে ঘন মেঘ ক'রে বৃষ্টি হ'তে লাগ্‌লো। কথা আছে সকাল সাড়ে সাতটার সময় মোটর-কোম্পানীর একটি মোটরগাড়ি এসে আমাদের বহন ক'রে পাহাড়ে নিয়ে যাবে; সে-গাড়িখানা আর-একজন আর-এক জায়গায় নিয়ে যাবে ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছিলো। সেখানা না পেলে দুঃখ আরো নিবিড়তর হবে—তাই রথী গিয়ে নানা লোকের কাছে নানা কাকুতি মিনতি ক'রে সেটা ঠিক ক'রে এসেচেন। ভাড়া লাগ্‌বে একশো পঁচিশ টাকা—আমাদের সেই হাতী-কেনার চেয়ে বেশি। যা হোক্, পৌনে আটটার সময় গাড়ি এলো—তখন বৃষ্টি থেমেচে। গাড়ি তো বায়ুবেগে চ'ল্‌লো, কিছুদূর গিয়ে দেখি, একখানা বড়ো মোটরের মালগাড়ি ভগ্ন অবস্থায় পথপার্শ্বে নিশ্চল হ'য়ে আছে। পূর্ব্বদিনে

আমাদের জিনিসপত্র এবং সাধুচরণকে নিয়ে এই গাড়ি রওনা হ'য়েছিলো; এই পর্য্যন্ত এসে তিনি স্তব্ধ হ'য়েচেন। জিনিস তা'র মধ্যেই আছে, সাধু ভাগ্যক্রমে একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি পেয়ে চ'লে গেচে। জিনিস রইলো প'ড়ে, আমরা এগিয়ে চ'ল্‌লুম। বিদেশে, বিশেষত শীতের দেশে, জিনিসে-মানুষে বিচ্ছেদ সুখকর নয়। সইতে হ'লো। যা হোক্, শিলং-পাহাড়ে এসে দেখি, পাহাড়টা ঠিক আছে: আমাদের গ্রহ-বৈগুণ্যে বাঁকেনি, চোরেনি, ন'ড়ে যায়নি: আমাদের জিওগ্রাফিতে তা'র যেখানে স্থান ঠিক সেই জায়গাটিতে সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। দেখে আশ্চর্য্য বোধ হ'লো, এখনো পাহাড়টা ঠিক আছে; তাই তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি কিন্তু আর বেশি লিখ্‌লে ডাক পাওয়া যাবে না। অতএব ইতি—কৃষ্ণা তৃতীয়া, ১৩২৬।

৩৯

ব্রুক্‌সাইড্

শিলং

আমি যেদিন এখানে এসে পৌঁচলুম সেদিন থেকেই বৃষ্টি-বাদলা কেটে গিয়েচে। আজ এই সকালে উজ্জ্বল

রৌদ্রালোকে চারিদিক প্রসন্ন ; মোটা মোটা গোটাকতক মেঘ পাহাড়ের গা আঁক্‌ড়ে ধ'রে চুপ্‌চাপ রোদ পোয়াচ্চে ; তাদের এম্‌নি বেজায় কুঁড়ে রকমের চেহারা-যে, শীঘ্র তা'রা বৃষ্টি বর্ষণে লাগ্‌বে এমন মনেই হয় না।

আমার এখানকার লেখ্‌বার ঘরের সঙ্গে শান্তি-নিকেতনের সেই কোণটার কোনো তুলনাই হয় না। বেশ বড়ো ঘর—নানা রকমের চৌকি, টেবিল, সোফা, আরামকেদারায় আকীর্ণ। জান্‌লাগুলো সমস্তই শার্সির, তা'র ভিতর থেকে দেখ্‌তে পাচ্চি, দেওদার গাছগুলো লম্বা হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাতাসে মাথা নেড়ে নেড়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে ইসারায় কথা বল্‌বার চেষ্টা ক'র্‌চে। বাগানের ফুলগাছের চান্‌কায় কত রঙ-বেরঙের ফুল-যে ফুটেচে তা'র ঠিক নেই,—কত চামেলি কত চন্দ্রমল্লিকা, কত গোলাপ,—আরো কত অজ্ঞাত-কুলশীল ফুল। আমি ভোরে সূর্য্য ওঠ্‌বার আগেই রাস্তার দুইধারের সেই সব ফোটা ফুলের মাঝখান দিয়ে পায়চারি ক'রে বেড়াই—তা'রা আমার পাকা দাড়ি আর লম্বা জোব্বা দেখে একটুও ভয় পায় না—হাসাহাসি করে।

এই পর্য্যন্ত লিখেচি, এমন সময়ে সাধু এসে খবর

দিলে, স্নানের জল তৈরি। অম্নি কলম রেখে চৌকি ছেড়ে রবিঠাকুর দ্রুতপদবিক্ষেপে স্নানযাত্রায় গমন ক'র্লেন। স্নান ক'রে বেরিয়ে এসে খবর পাওয়া গেল—কী খবর বলো দেখি? আন্দাজ ক'রে দেখো। খবর পাওয়া গেল-যে, রবিঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত—শ্রীযুক্ত তুলসী নামক উৎকলবাসী পাচকের স্বহস্তে পাক-করা। আহার সমাধা ক'রে এই আস্চি—সুতরাং চিঠির ওভাগে পূর্ব্বাহ্ণ ছিল, এ ভাগে অপরাহ্ণ প'ড়েচে—এখন ঘড়ির কাঁটা বেলা একটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'র্চে। সেই মোটা মেঘগুলো শাদা-কালো রঙের কাবুলি বেড়ালের মতো এখনো অলস-ভাবে স্তব্ধ হ'য়ে রৌদ্রে পিঠ লাগিয়ে প'ড়ে আছে। পাখী ডাক্চে আর জানালার ভিতর দিয়ে চামেলি ফুলের গন্ধ আস্চে।

ঐ মেঘগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে একটা লম্বা কেদারা আশ্রয় ক'রে নিস্তব্ধভাবে জানালার কাছে যদি ব'স্তে পার্তুম তা হ'লে সুখী হতুম কিন্তু অনেক চিঠি লিখ্তে বাকি আছে। অতএব গিরি-শিখরে এই শরতের অপরাহ্ণ আমার চিঠি লিখেই কাট্বে। তুমি ছবি আঁকচো কি না লিখো; আব সেই এস্রাজের উপর

তোমার ছড়ি চ'ল্‌বে কিনা তাও জান্‌তে চাই। ইতি ২৮শে আশ্বিন, ১৩২৬ (তারিখ ভুল করিনি—পাঁজি দেখে লিখেচি)।

৪০

শান্তিনিকেতন

তুমি এত দেরিতে কেন আমার চিঠি পেয়েচো, ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। আজ তোমার চিঠি পেতে দেরি হ'লো দেখে ভাব্‌লুম হয় তো অমৃতসর কংগ্রেসে তোমাকে ডেলিগেট ক'রেচে কিম্বা হাওয়া-জাহাজে কাপ্তেন রসের সঙ্গে তুমি অষ্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েচো। কিম্বা হিমালয়ের পর্ব্বত-শৃঙ্গে কোনো পওহারী বাবার শিষ্য হ'য়ে মাটির নীচে ব'সে একমনে নিজের নাকের ডগা নিরীক্ষণ ক'র্‌চো কিম্বা লয়েড্ জর্জ্জের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর সর্দ্দি হ'য়েচে খবর পেয়েই তুমি সেই পদের জন্য দরখাস্ত ক'র্‌তে ইংলণ্ডে চ'লে গিয়েচো। আমি পার্লামেণ্টে লয়েড্ জর্জ্জকে টেলিগ্রাফ ক'র্‌তে যাচ্চি ঠিক এমন সময়ে তোমার চিঠি পেলুম। প'ড়ে

দেখি, তুমি ঝর্ণার ধারে কোথায় বেড়াতে গিয়ে আর একটু হ'লেই কুয়োর মধ্যে প'ড়ে গিয়েছিলে। আশ্চর্য্য —দেখো, কাল সন্ধ্যাবেলায় আমারো প্রায় সেই রকম দুর্ঘটনা ঘটেছিলো। তখন রাত্তির ন-টা। মুখ ধুয়ে বিছানায় শুতে যাচ্চি, এমন সময় কী বলো দেখি? কুয়ো? সেই রকমই বটে। এক কপি নৌকাডুবি ব'লে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এক গল্পের বই,— হঠাৎ তারি মধ্যে একবার হুঁচট্ খেয়ে প'ড়ে গেলুম। একেবারে শেষ পাতা পর্য্যন্ত তলিয়ে গেলুম। এত বড়ো বিপদ ঘটবার কারণ হ'চ্চে, বিলাত থেকে একজন ইংরেজ ঐ বইটা তর্জ্জমা কর্‌বার অনুমতি নিয়েছিলেন। আবার সেদিন আর-একজন ইংরেজ ঐটে তর্জ্জমা ক'র্‌তে চেয়ে আমাকে চিঠি লিখেচেন। তাতেই আমার দেখ্‌বার ইচ্ছা হ'লো, ওটার মধ্যে কী আছে। কিন্তু সেই ইচ্ছেটা রাত ন-টার সময় হঠাৎ উদয় হওয়া কোনো শুভগ্রহের প্রভাবে নয়। কারণ এই কুয়োটা থেকে উদ্ধার হ'তে রাত তিনটা বেজে গেল। তা'র মানে আমার পরমায়ু্ থেকে একটা রাতের বারো আনার ঘুম গেল অনন্তকালের মতো হারিয়ে। আজ সকালবেলা আমার মুখ-চোখ দেখে সি, আই, ডি

পুলিশ সন্দেহ ক'র্‌চে কাল রাত্রে আমি কোথায় সিঁধ কাট্‌তে গিয়েছিলুম।

ঐ-যে ডাক-হরকরা আস্‌চে। একরাশ চিঠি দিয়ে গেল। তোমার বাবার হাতের লেখা এক লেফাফা দেখ্‌তে পাচ্চি,—তা'র মধ্যে তোমাদের আধুনিক ইতিহাস কিছু পাওয়া যাবে। ওদিকে আবার কাল রাত্রে এক ইংরেজ অতিথি এসেচেন—আজ সমস্ত দিন তিনি বিদ্যালয় পর্য্যবেক্ষণ ক'র্‌বেন, সেই সঙ্গে আমাকেও পর্য্যবেক্ষণ ক'র্‌বেন ব'লে বোধ হচ্চে। যখন ক'র্‌বেন তখন হয় তো ঢুল্‌বো—আর তিনি তাঁর নোটবুকে লিখে নিয়ে যাবেন-যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমস্ত দিন ধ'রে কেবল ঢোলেন। এম্‌নি ক'রেই জীবন-চরিত লেখা হয়। সাহেব যখন আমার জীবন-চরিতে এই কথা লিখ্‌বেন তখন তুমি খুব জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ ক'রো,—ব'লো, আমার অনেক দোষ থাক্‌তে পারে, দিনে ঢোলা অভ্যাস একেবারেই নেই। যাই হোক্, তুমি লয়েড্ জর্জ্জের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করোনি, এইটাতে আমার মন অনেকটা আশ্বস্ত হ'য়েচে। ইতি ২৮শে পৌষ, ১৩২৬।

৪১

সাম্‌নে তোমার পরীক্ষা—এখন দিনরাত তোমার মাথায় সেই ভাবনা লেগে আছে। অ্যালজেব্রা নিয়ে প'ড়ে থাক্‌বে, তোমার ভয় হবে—আমার কাছে থাক্‌লে পাছে তোমার নামতা ভুল হ'য়ে যায়, আর পাছে Animal বানান ক'র্‌তে গিয়ে Annie mull লিখে বসো। এই কথা মনে ক'রেই আমি উদাস হ'য়ে একেবারে অজন্তা-গুহার মধ্যে চ'লে যাচ্ছিলুম। তুমি যদি আমাকে আট্‌কে রাখ্‌তে চাও, তা হ'লে কিন্তু অ্যালজেব্রার বইখানা তোমার ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রাখ্‌তে হবে।

দেখো, এবারকার চিঠিতে তোমাকে একটুও ঠাট্টা করিনি—ভয়ঙ্কর গম্ভীর ভাষায় তোমাকে লিখ্‌লুম। তুমি পরীক্ষা দিতে যাচ্চো, আমি কোনো দিন পরীক্ষা দিইনি—এইজন্যে ভয়ে, সম্ভ্রমে, ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় আমার মুখ থেকে একটিও ঠাট্টার কথা বেরোতে চাচ্চে না—আমি নতশিরে এই কথাই কেবল আবৃত্তি ক'র্‌চি—

যা দেবী পাঠ্যগ্রন্থেষু ছাত্রীরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

ইতি ১লা আশ্বিন, ১৩২৮।

৪২

একটা বিষয়ে আমার মনে বড়ো খট্‌কা লেগেচে, তুমি চিঠিতে লিখেচো—আমি নিশ্চয়ই তোমার দিদির চেয়ে বেশি ইংরেজি জানি। এটা কি উচিৎ? তোমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা, কলেজে পড়ে, তা'র ইংরেজি জ্ঞানের প্রতি এত বড়ো অবজ্ঞা প্রকাশ কি ভালো হ'য়েচে? সে যদি জান্‌তে পারে তা হ'লে তা'র মনে কত বড়ো আঘাত লাগ্‌বে—একবার ভেবে দেখো দেখি। আমার চিঠি পেয়েই তা'র কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা ক'রো।

তা'র মতো আমি যদি ইংরেজিতে পরীক্ষা পাশ ক'র্‌তে পার্‌তুম তা হ'লে কি এমন বেকার ব'সে থাক্‌তুম? তা হ'লে অন্ততঃ পুলিশের দারোগাগিরি জোগাড় ক'র্‌তে পার্‌তুম। চিরদিন স্কুল পালিয়ে কাটালুম, কুঁড়েমি ক'রেই এমন মানবজন্মের সাতাশটা বছর * বৃথা নষ্ট ক'র্‌লুম—এইজন্যে পাছে আমার

* ভানুসিংহের বয়স-যে সাতাশ বছরে এসে চিরকালের মতো ঠেকে গেচে, বালিকার এই একটি স্বরচিত বয়ঃপঞ্জীর বিধান ছিল।

কুদৃষ্টিতে তোমাদের হঠাৎ বানান-ভুলে পেয়ে বসে তাই তো সহর ছেড়ে তোমাদের কাছে থেকে দূরে দূরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। এবারকার মতো যা হবার তা হ'লো, আর জন্মে ম্যাট্রিকুলেশন যদি বা না পারি তো অন্ততঃ মাইনর্ ইস্কুলের ছাত্রবৃত্তি নিয়ে তবে ছাড়্‌বো। কিছু না হোক্, অন্ততঃ ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত অঙ্ক ক'ষবোই, আর ফার্ষ্ট সেকেণ্ড তুটো রীডার যদি শেষ ক'র্‌তে পারি তা হ'লে গাঁয়ের প্রাইমারি ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টারি ক'র্‌তে পার্‌বো, আর তারি সঙ্গে সঙ্গে মাসিক সাড়ে আট টাকা বেতনে ব্রাঞ্চ পোষ্ট-আফিসের পোষ্টমাষ্টারি-পদটাও জোগাড় ক'রে নেবার চেষ্টা ক'র্‌বো। নেহাৎ না পাই যদি, তবে জমিদারবাবুর কনিষ্ঠ ছেলেটির প্রাইভেট টিউটরের কাজটা নিশ্চয় জুটবে, ইতি ৭ই আশ্বিন, ১৩২০।

৪৩

আজ বুধবার—আজ ছুটির দিনে আমার বারান্দার সেই কোণটায় ব'সে তোমাকে লিখ্‌চি। মাঘের তুপুরবেলাকার রৌদ্রে আমার ঐ আমলকী-বীথিকার মধ্যে দিনটি রমণীয় লাগচে। এইরকম দিনে কাজ ক'রতে

ইচ্ছে করে না—আমার সমস্ত মনটি ঐ ডালের উপরে বসা ফিঙে পাখীটির মতো চুপ ক'রে রোদ পোহায়। আজ উত্তুরে-হাওয়া থেকে থেকে উতলা হ'য়ে উঠ্‌চে—শালবনের পাতায় পাতায় কাঁপুনি ধ'রেচে—একটা মস্ত কালো ভ্রমর মাঝে মাঝে অকারণ আমার কাছে এসে গুন্‌গুনিয়ে আবার বেরিয়ে চ'লে যাচ্চে—একটা কাঠবিড়ালি এই বারান্দার কাঠের খুঁটি বেয়ে চালের কাছে উঠে কিসের ব্যর্থসন্ধানে চঞ্চল চক্ষে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার তখনি পিঠের ওপর ল্যাজ তুলে হুড় হুড় ক'রে নেমে যাচ্চে। এই শীতের মধ্যাহ্নে যেন আজ কারো কিছু কাজ নেই।

আমি সমস্ত সপ্তাহ ধ'রে একটা নাটক লিখ্‌ছিলুম—শেষ হ'য়ে গেচে তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা "প্রায়শ্চিত্ত" নয়, এর নাম "পথ"। এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত-নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই—সে গল্পের কিছু এতে নেই, সুরমাকে এতে পাবে না।

তুমি পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছো—আমার এই কুঁড়েমির চিঠিতে পাছে তোমার জিওমেট্রির ধ্যান ভঙ্গ করে, এই ভয় আছে। ৪ঠা মাঘ, ১৩২৮।

৪৪

তুমি রোজ দুটো ক'রে ডিম খেয়ে একটিমাত্র ক্লাসে প'ড়্চো খবর পেয়েই খুসী হ'য়ে তোমাকে চিঠি লিখ্তে ব'সেচি। আমিও ঠিক দুটি ক'রে ডিম খাই আর একটি মাত্র ক্লাসেও পড়িনে। সেইটেতে আমার মুস্কিল বেধেচে, কেন না, যদি আমার ক্লাস থাক্তো, যদি আমাকে নামতা মুখস্ত ক'র্তে হ'তো তা হ'লে সব সময়ই আমার কাছে লোক আনাগোনা ক'র্তে পার্তো না; আমি ব'ল্তে পার্তুম, আমার সময় নেই, আমাকে এক্জামিন্ দিতে হবে। তোমার ভারি সুবিধে—তোমার কাছে কইম্বাটুর থেকে ত্রিম্বাকুটু থেকে কাঞ্জিভ্যারাম থেকে কামস্কাট্া থেকে মক্কা থেকে মদিনা মস্কট থেকে যখন-তখন নানালোক মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে আসেন না—তাঁরা জানেন-যে, মার্চ্চ মাসে তোমাকে ম্যাট্রিকুলেশন্ দিতে হবে: আমি তাই এক-একবার মনে করি—আমি ম্যাট্রিকুলেশন দেবো—দিলে নিশ্চয়ই ফেল্ ক'র্বো—ফেল করার সুবিধে এই-যে, ফি-বৎসরেই ম্যাট্রিকুলেশন্ দেওয়া যায় আর তা হ'লে ত্রিম্বাকুটু থেকে নিজনি-

নবগরড থেকে বেচুয়ানাল্যাণ্ড থেকে সদাসর্ব্বদা লোক-আসা বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে।

লেভি সাহেব আমার বন্ধু হ'য়েও তোমার কাছে হেমনলিনীর কথাটা ফাঁস ক'রে দিয়েচেন, এতে আমি মনে বড়ো দুঃখ পেয়েচি—এ কথা সত্য-যে, আমি তা'রই সাধনায় প্রবৃত্ত আছি। কিন্তু সেই স্বর্ণ-শতদলের পাপ্‌ড়িগুলি হ'চ্চে bank notes। সাধনায় বিশেষ-যে সিদ্ধিলাভ ক'র্‌তে পেরেচি—তা মনেও ক'রো না, তোমরা কামনা ক'রো এই হেমনলিনী যেন আমার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু কপালক্রমে আমার পঞ্জিকায় অকাল প'ড়েচে—শুভলগ্ন আর আসেই না, তাই গান গাচ্চি—

ওগো হেমনলিনী

আমার দুঃখের কথা কারো কাছে বলিনি।
লক্ষ্মীর চরণতলে ফুটে আছো শতদলে
সে-পথ করিয়া লক্ষ্য কেন আমি চলিনি?

ইতি ১০ ফাল্গুন, ১৩২৮।

৪৫

আমি নদী-পথে কয়েকদিন কাটিয়ে এলুম—কাল রাত্রে ফিরে এসেচি। আজ সকালে দেখি, এখানে তোমাব চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা ক'র্‌ছিলো। তুমি জানো—আমি নদী ভালোবাসি। কেন, ব'ল্‌বো? আমরা যে-ডাঙার উপরে বাস করি, সে-ডাঙা তো নড়ে না, স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়ে থাকে, কিন্তু নদীর জল দিনরাত্রি চলে, তা'র একটা বাণী আছে। তা'র ছন্দের সঙ্গে আমাদের রক্ত-চলাচলের ছন্দ মেলে, আমাদের মনে নিরন্তর যে-চিন্তাস্রোত ব'য়ে যাচ্চে সেই স্রোতের সঙ্গে তা'র সাদৃশ্য আছে—এই জন্যে নদীর সঙ্গে আমার এত ভাব। বয়স যখন আরো কম ছিল, তখন কতকাল নৌকায় কাটিয়েচি, কোনো জনমানব আমার কাছেও থাক্‌তো না, পদ্মার চরের উপরকার আকাশে সন্ধ্যাতারা আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাক্‌তো; প্রতিবেশী ছিল চক্রবাকের দল; তাদের কলালাপ থেকে আর কিছু বুঝি বা না বুঝি, এটুকু জান্‌তুম আমার সম্বন্ধে কোনো জনরব তা'রা রটাতো না—এমন কি, আমার জয়-পরাজয় নামক

গল্পের নায়ক-নায়িকার পরিণাম সম্বন্ধে তা'রা লেশমাত্র কৌতূহল প্রকাশ ক'র্তো না।

যা হোক, তেহি নো দিবস গতাঃ,—এখন বোলপুরের শুষ্ক ধূসর মাঠের মধ্যে ব'সে ইস্কুল-মাষ্টারি ক'র্চি; ছেলেগুলোর কলরব চক্রবাকের কল-কোলাহলকে ছাড়িয়ে গেচে। তুমি মনে ক'রো না, এখানে কোনো স্রোত নেই; এখানে অনেকগুলি জীবনের ধারা মিলে একটি সৃষ্টির স্রোত চ'লেচে; তা'র ঢেউ প্রতি মুহূর্ত্তে উঠ্‌চে, তা'র বাণীর অন্ত নেই। সেই স্রোতের দোলায় আমার জীবন আন্দোলিত হ'চ্চে, আপনার পথ সে কাট্‌চে, দুইতটকে গ'ড়ে তুল্‌চে। সে কোন্‌ এক অলক্ষ্য মহাসমুদ্রের দিকে চ'লেচে, দূর থেকে আমরা তা'র বার্ত্তার আভাস পাই মাত্র। ইতি ২২শে পৌষ, ১৩২৮।

৪৬

শিলাইদা

তুমি আমাকে চিঠি লিখেচো শান্তিনিকেতনে, আমি সেটি পেলুম এখানে অর্থাৎ শিলাইদহে।

তুমি কখনো এখানে আসোনি, সুতরাং জান্‌তে পারবে না---জায়গাটা কী রকম। বোলপুবের সঙ্গে এখানকার চেহারার কিছুমাত্র মিল নেই। সেখানকার রৌদ্র বিরহীর মতো, মাঠের মধ্যে একা ব'সে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেল্‌চে, সেই তপ্ত নিশ্বাসে সেখানকার ঘাসগুলো শুকিয়ে হ'ল্‌দে হ'য়ে উঠেচে। এখানে সেই রৌদ্র তা'র সহচরী ছায়াব সঙ্গে মিলেচে; তাই চাবিদিকে এত সরসতা। আমাদের বাড়ির সাম্‌নে সিসু-বীথিকায় তাই দিনরাত মর্ম্মরধ্বনি শুনচি, আর কনকচাঁপার গন্ধে বাতাস বিহ্বল, কয়েৎবেলের শাখায় প্রশাখায় নতুন চিকণ পাতাগুলি ঝিল্‌মিল্‌ ক'রচে, আর ঐ বেণুবনের মধ্যে চঞ্চলতার বিরাম নেই। সন্ধ্যার সময় টুকরো চাঁদ যখন ধীরে ধীবে আকাশে উঠ্‌তে থাকে তখন সুপুরিগাছের শাখাগুলি ঠিক যেন ছোটো ছেলের হাত নাড়ার মতো চাঁদমামাকে টী দিয়ে যাবার জন্যে ইসারা ক'রে ডাক্‌তে থাকে। এখন চৈত্রমাসের ফসল সমস্ত উঠে গিয়েচে, ছাদের থেকে দেখ্‌তে পাচ্চি, চষা মাঠ দিক-প্রান্ত ছড়িয়ে প'ড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কিছু বৃষ্টির জন্যে। মাঠের যে-অংশে বাবলাবনের নীচে চাষ পড়েনি

সেখানে ঘাসে ঘাসে একটুখানি স্নিগ্ধ সবুজের প্রলেপ, আর সেইখানে গ্রামের গরুগুলো চ'রচে। এই উদার-বিস্তৃত চষা মাঠের মাঝে মাঝে ছায়াবগুণ্ঠিত এক-একটি পল্লী—সেইখান থেকে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ বেয়ে গ্রামের মেয়েরা ঝকঝকে পিতলের কলসী নিয়ে দুটি তিনটি ক'রে সার বেঁধে প্রায় সমস্ত বেলাই জলাশয় থেকে জল নিতে চ'লেচে। আগে পদ্মা কাছে ছিল—এখন নদী বহুদূরে স'রে গেচে—আমার তেতালা ঘরের জানালা দিয়ে তা'র একটুখানি আভাস যেন আন্দাজ ক'রে বুঝতে পারি, অথচ একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল। শিলাইদহে যখনই আসতুম তখন দিনরাত্তির ঐ নদীর সঙ্গেই আমার আলাপ চ'লতো; রাত্রে আমার স্বপ্নের সঙ্গে ঐ নদীর কলধ্বনি মিশে যেতো আর নদীর কলস্বরে আমার জাগরণের প্রথম অভ্যর্থনা শুনতে পেতেম। তা'রপরে কত বৎসর বোলপুরের মাঠে মাঠে কাটলো, কতকাল সমুদ্রের এপারে ওপারে পাড়ি দিলুম—এখন এসে দেখি সে-নদী যেন আমাকে চেনে না। ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে কত মাঠ, কত গ্রামের আড়াল,

সবশেষে উত্তর-দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতর পাড়ের মতো একটি বনরেখা দেখা যায়। সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ যে একটি ঝাপ্‌সা বাষ্পলেখাটির মতো দেখ্‌তে পাচ্চি, জানি ঐ আমার সেই পদ্মা। আজ সে আমার কাছে অনুমানের বিষয় হ'য়েচে। এই তো মানুষের জীবন। ক্রমাগতই কাছের জিনিস দূরে চ'লে যায়, জানা জিনিস ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে, আর যে-স্রোত বন্যার মতো প্রাণমনকে প্লাবিত ক'রেচে, সেই স্রোত একদিন অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মতো জীবনের একান্তে অবশিষ্ট থাকে।

এখন বেলা ফুরিয়ে এসেচে, অল্প একটুখানি মেঘেতে আকাশ ঢাকা, দিনাবসানেও বাগানে পাখীর ডাকে একটুও ক্লান্তি দেখ্‌চিনে। দুই কোকিলে কেবলি জবাব চ'লেচে, কেউ হার মান্‌তে চাচ্চে না—তা ছাড়া আরও অনেক পাখী ডাক্‌চে, তাদের ডাক স্পষ্ট ক'রে চেনা যায় না। সকলের ডাক মিশিয়ে জড়িয়ে গেচে, অন্য দিনের মতো বাতাস আজ দুরন্ত নয়, ঝাউগাছগুলি স্তব্ধ এবং নিঃশব্দ হ'য়ে গেচে। আজ অষ্টমীর চাঁদ দেখ্‌চি মেঘের পর্দ্দার আড়ালে রাত্রিযাপন ক'রবে।

আমার ঘরের দক্ষিণদিকে ঐ ছাদে একটি কেদারা পাতা আছে—ঐখানে সন্ধ্যার সময় আমি গিয়ে বসি। এ কয়দিন দ্বিতীয়ার চাঁদ থেকে আরম্ভ ক'রে অষ্টমীর চাঁদ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই উদয়কালে এই কবির সঙ্গে মুকাবিলা ক'রেচে। ঐ চাঁদ হ'চ্চে আমার জন্মদিনের অধিপতি। আমি যখন ছাদে বসি তখন আমার বামে পূর্ব্ব আকাশ থেকে বৃহস্পতি আমার মুখের দিকে তাকায় আর পশ্চিম আকাশ থেকে চন্দ্রমা। —এইবার ক্রমে একটু অন্ধকার হ'য়ে আসচে—ঘরের মধ্যকার এই ঘোলা আলোয় আর দৃষ্টি চ'ল্‌চে না, বাইরে গিয়ে বস্‌বার সময় হ'লো।

তুমি আমার কাছে বড়ো চিঠি চেয়েছিলে, বড়ো চিঠিই লিখ্‌লুম। লিখ্‌তে পার্‌লুম, তা'র কারণ এখানে অবকাশ আছে। কিন্তু এই চিঠি যখন ডাকে দেবো, অর্থাৎ কাল বৃহস্পতিবারে,—ক'ল্‌কাতায় রওনা হবো। সেখানে ট্রাম আছে, মোটর আছে, ইলেক্‌ট্রিক্‌-পাখা আছে ; সময় নেই। তা'রপরে বোলপুরে যাবো, —সেখানে শালের বনে ফুল ফুটেচে, আমবাগানে ফল ধ'রেচে ; সেখানে মাঠ আছে বিস্তীর্ণ, আকাশ আছে অবারিত, কিন্তু সেখানেও অবকাশ নেই।

চিঠি জিনিসটা ছোট্ট, মালতী-ফুলের মতো, কিন্তু সেই চিঠি যে-আকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে সেই আকাশ মালতী-লতারই মতো বড়ো। আমাদের যত কেজো লোকের অবকাশ টবের গাছ, তা'র থেকে যে-সব পত্রোদ্গম হয় সে তো পোষ্টকার্ডের চেয়ে বড়ো হ'তে চায় না। ইতি ২২ চৈত্র, ১৩২৮।

৪৭

শান্তিনিকেতন

এতদিনে তুমি কাশী পৌঁছেচো, পথের মধ্যে ভিড় পাওনি তো? এখন কেমন আছো—লিখো। তোমার যাবার পরদিন থেকেই বিদ্যালয়ের কাজ রীতিমতো আরম্ভ হ'য়ে গেচে, রোজই কমিটি, মিটিং এবং ক্লাসের কাজও চ'ল্‌চে। ছেলেরা অনাবৃষ্টির পরে আষাঢ়ের ধারার মতো কলরব ক'র্‌তে ক'র্‌তে এখানকার শূন্য ঘর সব পূর্ণ ক'রে দিয়েচে। এখন আমার কাজের আর অন্ত নেই।

মেয়েরা সকলেই পরশুরাম হ'য়ে উঠেচে—কুড়ুল দিয়ে ঠকাঠক্ গাছ কাট্‌তে লেগে গেচে। তা'রা আছে

ভালো। এদিকে আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি সুরু হ'য়েচে, আব বৃষ্টিস্নাত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রোদ্দুর তা'র পরশপাথর ঠেকিয়ে সমস্ত আকাশকে সোনা ক'রে তুলেচে। আমি আমার সাম্‌নের খোলা জান্‌লা দিয়ে ঐ শাল, তাল, শিরীষ, মহুয়া, ছাতিমের দল-বাঁধা বনের দিকে প্রায় তাকিয়ে থাকি। এখন আমার ঘড়িতে সাড়ে দুপুর, অর্থাৎ সাধারণ ঘড়িতে দুপুর। ছেলেরা তাদের মধ্যাহ্নভোজন শেষ ক'রে দলে দলে কুয়োতলায় মুখ ধুতে আস্‌চে—দীর্ঘ ছুটির দুঃখ-দিনের পরে কাকগুলো এঁটো শালপাতার উপর শ্রাদ্ধবাড়ির ভিখিরীর পালের মতো এসে প'ড়েচে। বাতাসটি মধুর হ'য়ে বইচে, জাম গাছের চিকণ পাতার ঘনিমার উপর রোদ্র ঝিল্‌মিল্ ক'রে উঠ্‌চে, পাটল রঙের দুটো গরু ল্যাজ দিয়ে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে ধীর মন্দ গমনে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্চে—আমি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌চি আর ভাব্‌চি। ইতি ১ জুলাই ১৩২৯।

৪৮

ক'ল্‌কাতা

ক'ল্‌কাতা সহরটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে—মনে হয় যেন ইট-কাঠের একটা মস্ত জন্তু আমাকে একেবারে গিলে ফেলেচে। তা'র উপরে আবার আকাশ মেঘে লেপা, রাত্তির থেকে টিপ্‌টিপ্ ক'রে বৃষ্টি প'ড়্‌চে। শান্তিনিকেতনের মাঠে যখন বৃষ্টি নামে তখন তা'র ছায়ায় আকাশের আলো করুণ হ'য়ে আসে, ঘাসে ঘাসে পুলক লাগে, গাছগুলি যেন কথা কইতে চায়, আমার মনের মধ্যে গান জেগে ওঠে আর তা'র সুর গিয়ে পৌঁছোয় দিনুর ঘরে। আর এখানে নববর্ষা বাড়ির ছাদে ঠোকর খেতে খেতে খোঁড়া হ'য়ে পড়ে,—কোথায় তা'র নৃত্য, কোথায় তা'র গান, কোথায় তা'র সবুজ রঙের উত্তরীয়, কোথায় তা'র পূবে বাতাসে উড়ে-পড়া জটাজাল।

কথা হ'চ্চে, এবার শ্রাবণ মাসে আর বছরের মতো ক'ল্‌কাতায় বর্ষামঙ্গল গান হবে। কিন্তু যে-গান শান্তিনিকেতনের মাঠে তৈরি সে-গান কি ক'ল্‌কাতা সহরের হাটে জ'ম্‌বে? এখানে অনুরোধে প'ড়ে কখনো

কখনো আমার নতুন বর্ষার গান গাইতে হ'য়েচে। কিন্তু এখানকার বৈঠকখানায় সেই গানের সুর ঠিক মতো বাজে না। তোমাদের ওখানে এতদিনে বোধ হয় বর্ষা নেমেচে, অতএব তোমার নতুন শেখা বর্ষার গান কখনো কখনো গুন্‌গুন্‌ স্বরে গাইতে পার্‌বে, কখনো বা এস্‌রাজে বাজিয়ে তুল্‌বে। তুমি যাওয়ার পর আরো কিছু কিছু নতুন গান আমার সেই খাতায় জ'মে উঠেচে, ক'ল্‌কাতায় না এলে আরো জ'ম্‌তো। এদিকে দিনুবাবুও দাঁত তোলাবার জন্যে দু-তিন দিন হ'লো ক'ল্‌কাতায় এসেচেন;—আষাঢ় মাসের বর্ষাকে এ সহরে যেমন মানায় না, দিনুবাবুকেও তেমনি। আজ সকালেই সে পালাবে স্থির ক'রেচে।—ইতি ২৯ আষাঢ়, ১৩১৯।

৭৯

আত্রাই নামক একটি নদীর উপর বোটে ক'রে ভেসে চ'লেচি। বর্ষার মেঘ ঘন হ'য়ে আকাশ আচ্ছন্ন ক'রেচে, একটু ঝোড়ো বাতাসের মতো বইচে, পাল তুলে দিয়েচে। নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণ, স্রোত,

খরতর, দলে দলে শৈবাল ভেসে আস্‌চে। পল্লীর আঙিনার কাছ পর্য্যন্ত জল উঠেচে; ঘন বাঁশের ঝাড়; আম কাঁঠাল তেঁতুল কুল শিমুল নিবিড় হ'য়ে উঠে গ্রামগুলিকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেচে; মাঝে মাঝে নদীর তীরে তীরে কাঁচা ধানের ক্ষেতে জল উঠেচে, কচি ধানের মাথা জলের উপর জেগে আছে। দুই তটে স্তরে স্তরে সবুজ রঙের ঘনিমা ফুলে ফুলে উঠেচে, তারি মাঝখান দিয়ে বর্ষার খোলা নদীটি তা'র গেরুয়া রঙের ধারা বহন ক'রে ব্যস্ত হ'য়ে চ'লেচে, সমস্তটার উপর বাদল-সায়াহ্নের ছায়া। বৃষ্টি নেমে এলো—দূরে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যাস্তের একটা ম্লান আভা এই বৃষ্টিধারার আবেগের উপর যেন সান্ত্বনার ক্ষীণ প্রয়াসের মতো এসে প'ড়েচে।

আমার এই বোট ছাড়া নদীতে আর নৌকা নেই। এই জলস্থল আকাশের ছায়াবিষ্ট নিভৃত শ্যামলতার সঙ্গে মিল ক'রে একটি গান তৈরি ক'র্‌তে ইচ্ছে ক'র্‌চে, কিন্তু হয় তো হ'য়ে উঠ্‌বে না। আমার দুই চক্ষু এখন বাইরের দিকে চেয়ে থাক্‌তে চায়,—খাতার দিকে চোখ রাখ্‌বার এখন সময় নয়। অনেক দিন বোলপুরে শুক্‌নো ডাঙায় কাটিয়ে এসেচি, এখন এই

নদীর উপর এসে মনে হ'চ্চে,—পৃথিবীর যেন মনের কথাটি শুন্‌তে পাওয়া যাচ্চে। নদী আমি ভারি ভালোবাসি; আর ভালোবাসি আকাশ। নদীতে আকাশে চমৎকার মিলন, রঙে রঙে, আলোয় ছায়ায়, —ঠিক যেন আকাশের প্রতিধ্বনির মতো। আকাশ পৃথিবীতে আর কোথাও আপনার সাড়া পায় না এই জলের উপর ছাড়া।

আজ রাত্রের গাড়িতেই ক'ল্‌কাতায় যাবো মনে ক'রে ভালো লাগ্‌চে না। ইতি ২ শ্রাবণ, ১৩২৯।

৫০

আজ বুধবারে সকালে মন্দিরের কাজ শেষ ক'রে যেই আমার কুটীরের সাম্‌নে উত্তরদিকের বারান্দায় ব'সেচি অম্‌নি নানাবিধ চিঠি ও খবরের কাগজের সঙ্গে তোমার চিঠি এসে পৌঁচলো। এর আগে দু-এক দিন খুব ঘন বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছিলো, আজও স্তূপাকার কালো মেঘ আকাশক্ষেত্রের এদিকে ওদিকে ভ্রূকুটি ক'রে ব'সে আছে; এখনি তা'রা বৃষ্টিবাণ বর্ষণ ক'র্‌বে ব'লে ভয় দেখাচ্চে। কিন্তু আজ প্রথম সকালের মেঘের ফাঁক

দিয়ে অরুণোদয় খুব সুন্দর হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো। আমি তখন পূবদিকের বারান্দায় ব'সেছিলুম, আমার মনের সঙ্গে যেন তা'র মুখোমুখি কথা চ'ল্‌ছিলো। মন যেদিন তা'র চোখ মেলে, সেদিন প্রত্যেক সকাল-বেলাটিই তা'র কাছে অপূর্ব্ব হ'য়ে দেখা দেয়। বিশ্বলক্ষ্মী তাঁর অন্দরের দ্বারের কাছে রোজই দাঁড়িয়ে থাকেন, যেদিন আমরা প্রস্তুত হ'য়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাত পাতি, সেদিন তাঁর দান মুঠো ভ'রে পেয়ে থাকি। পৃথিবী থেকে যাবার সময় আমি এই কথা ব'লে যেতে পার্‌বো-যে, এমন দান আমি অনেক পেয়েচি।

সেপ্টেম্বরের আরম্ভে আমার বোম্বাই যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কেন না, সেপ্টেম্বরের ১৫ই তারিখে ক'ল্‌কাতায় আমাদের শারদোৎসবের পালা ব'স্‌বে— আমাকে সাজ্‌তে হবে সন্ন্যাসী। আমার এই সন্ন্যাসী সাজ্‌বার আর কোনো অর্থ নেই—অর্থ-সংগ্রহ ছাড়া। শুনে তোমরা বিস্মিত হ'য়ো না, তোমাদের বারাণসী-ধামে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা সন্ন্যাসী সেজেচেন অর্থের প্রত্যাশায়, আর যাঁদের প্রত্যাশা নিরর্থক হয়নি।

এল্‌ম্‌হার্ষ্ট সাহেব এসেচেন। তাঁর কাছে শুন্‌লুম

তুমিও নাকি আসক্তি-বন্ধন ছেদন ক'রে সন্ন্যাসিনী হবার চেষ্টায় আছো। সেইজন্যেই কি লজিক-পড়া সুরু ক'রেচো? কিন্তু লজিক জিনিসটা হ'চ্চে কাঁটা-গাছের বেড়া, তা'তে ক'রে মানসক্ষেত্রের ফসলকে নির্ব্বোধ গরু-বাছুরের উৎপাত থেকে রক্ষা করা চলে; কিন্তু আকাশ থেকে যে-সব বর্ষণ হয়, রৌদ্রই বলো, বৃষ্টিই বলো, তা'র থেকে নিরাপদ হবার উপায় তোমার ঐ ন্যায়শাস্ত্রের বেড়া নয়। তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েচো-যে, এবার আমার সঙ্গে দেখা হ'লে তুমি আমার লজিকের পরীক্ষা নেবে। আমি আগে থাক্‌তেই হার মেনে রাখ্‌চি। পৃথিবীতে দুই জাতের মানুষ আছে। একদলকে লজিকের নিয়ম পদে পদে মিলিয়ে চ'ল্‌তে হয়, কেন না তা'রা পায়ে হেঁটে চলে,—আর একদল ন্যায়শাস্ত্রের উপর দিয়ে চ'লে যায়, ঊনপঞ্চাশ বায়ু তাদের বাহন, তা'রা এপক্ষ ওপক্ষের বিরোধ খণ্ডন ক'র্‌তে ক'র্‌তে নিজের পথ খুঁজে মরে না,—তা'রা এককালে নিজেরই দুই পক্ষ বিস্তার ক'রে সেই পথ দিয়ে চ'লে যায়, যে-পথ হ'চ্চে রবি-কিরণের পথ।

এই প্রসঙ্গে, এই পত্র-লেখক কোন্ জাতের লোক তা'র একটু আভাসমাত্র যদি দিই তা হ'লে তুমি ব'লে

ব'স্‌বে—তিনি ভারি অহঙ্কারী। যারা লজিকের অহঙ্কার ক'রে তাল ঠুকে বেড়ায়, তা'রাই নন্‌লজিক্যাল্‌দের ব্যোমপথ-যাত্রার পক্ষ-বিধূননের মাহাত্ম্য খর্ব্ব কর্‌বার চেষ্টা করে। কিন্তু সে-মহিমা তো যুক্তির দ্বারা আত্ম-সমর্থনের অপেক্ষা করে না;—সে আপন অচিহ্নিত পথে আপন গতিবেগের দ্বারাই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

আজ এইখানেই ইতি। ১৩ই ভাদ্র, ১৩২৯।

৫১

তুমি-যে তোমার লজিকের খাতার পাতা ছিঁড়ে আমাকে চিঠি লিখেচো তা'তে বুঝ্‌তে পার্‌চি, লজিক সম্বন্ধে আলোচনা প'ড়ে তোমার উপকার হ'য়েচে। লজিক যেমনি পড়া হ'য়ে যায় অম্‌নি তা'র আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। যে-কলাপাতায় খাওয়া হ'য়ে যায়, সে-কলাপাতা ফেলে দিলে ক্ষতি হয় না; কিন্তু যে-তালপাতার উপর মেঘদূত লেখা হ'য়েচে সেটা ফেল্‌বার জিনিস নয়।

আমরা এবার দু-তিন দিন ধ'রে বর্ষামঙ্গল ক'রেচি।

তা'র ফল কী হ'য়েচে, একবার দেখো। আজ ভাদ্রমাসের আঠারই তারিখ, অর্থাৎ শরৎকালের আরম্ভ, কিন্তু বর্ষার আয়োজন এখনো ভরপুর র'য়েচে। আকাশ ঘন মেঘে কালো হ'য়ে আছে,—থেকে থেকে ঝমাঝম্ বৃষ্টি হ'চ্চে। আমার কবিত্বের এই আশ্চর্য্য প্রভাব দেখে আমি নিজেই অবাক্ হ'য়ে গেচি। এমন কি, শুন্‌তে পাই, আমার এই বর্ষামঙ্গলের জোর কাশী পর্য্যন্ত পৌঁচেচে। সেখানেও বৃষ্টি চ'ল্‌চে। বোধ হ'চ্চে, আমরা যখন শারদোৎসব ক'র্‌বো তা'রপর থেকেই শরতের আরম্ভ হবে। শারদোৎসবের রিহার্সালে আমাকে অস্থির ক'রেচে। রোজ দুপুরবেলায় বিভূতি এসে একবার ক'রে আমার কাছ থেকে আগাগোড়া পাঠ নিয়ে যায়; ছোটো ছেলেরা যে-রকম পড়া মুখস্থ করে আমাকে তাই ক'র্‌তে হয়। কিন্তু এমনি আমার বুদ্ধি, তবু রিহার্সালের সময় কেবল ভুলি—ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত হাসে—এত অপমান সে আর কী ব'ল্‌বো।

যাই হোক্, যদি তুমি আমার শারদোৎসব দেখ্‌তে আসো তা হ'লে বোধ হয় দেখ্‌বে, ঠিক ঠিক মুখস্থ ব'লে যাচ্চি। তোমার বাবাকে শারদোৎসব দেখ্‌বার জন্যে

আস্‌তে ব'লে দিয়েচি। কিন্তু যে-রকম ব্যস্ত মানুষ, তাঁর মনে থাক্‌লে হয়। ঐ বিভূতি এলো—এইবার আমার পড়া দিইগে যাই। ১৮ই ভাদ্র, ১৩২৯।

৫২

কলিকাতা

ক'ল্‌কাতায় সব দলবল নিয়ে উপস্থিত হ'য়েচি। আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ি একতলা থেকে তিনতলা পর্য্যন্ত কলরবে মুখরিত হ'য়ে উঠেচে; পা ফেল্‌তে সাবধান হ'তে হয়, পাছে একটা না একটা ছেলেকে মাড়িয়ে দিই, এমনি ভিড়। আমি অন্যমনস্ক মানুষ, কোন্ দিকে তাকিয়ে চলি তা'র ঠিক নেই। ওরা যখন-তখন কোনো খবর না দিয়ে আমার পায়ের কাছে এসে প'ড়ে প্রণাম করে। কখন্ তাদের মাটির সঙ্গে চ্যাপ্টা ক'রে দিয়ে তাদের উপর দিয়ে চ'লে যাবো এই ভয়ে এই ক-দিন ধূলোর দিকে চেয়ে চেয়ে চ'ল্‌চি।

মেয়ের দলও এবার নেহাৎ কম নয়। নুটু থেকে আরম্ভ ক'রে অতি সূক্ষ্ম অতি ক্ষুদ্র লতিকা পর্য্যন্ত। ননীবালা তাদের দিনরাত সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে হয়রাণ

হ'য়ে প'ড়েচে। কিন্তু আমাকে দেখ্‌বার লোক কেউ নেই; স্বয়ং এণ্ড্রুজ সাহেব পাঞ্জাবে আকালীদের নাকাল সম্বন্ধে তদন্ত ক'র্‌তে অমৃতসরে চ'লে গেচেন। লেভি সাহেবেরা গেচেন বোম্বাই; বৌমা আছেন শান্তিনিকেতনে। সুতরাং আমাকে ঠিকমতো শাসনে রাখ্‌তে পারে এমন অভিভাবক কেউ না থাকাতে আমি হয় তো উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে যেতে পারি এমন আশঙ্কা আছে। আপাততঃ যা-তা বই প'ড়্‌তে আরম্ভ ক'রেচি, কেউ নেই আমাকে ঠেকায়। তা'র মধ্যে লজিকের বই একখানাও নেই। এমনি ক'রে পড়া ফাঁকি দিয়ে বাজে পড়া প'ড়ে সাতাশ বছর কেটে গেল, এখন চেতনা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা'র কোনো লক্ষণ নেই।

আমি ভেবেছিলুম—সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তোমাদের ছুটি; তা যখন নেই তখন শারদোৎসব দেখা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব; কারণ ওটা হ'চ্চে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েচে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েচে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র হ'চ্চে—"বিনা কাজে বাজিয়ে

বাঁশী কাট্‌বে সকল বেলা।” ওর মধ্যে একটা উপনন্দ কাজ ক’র্‌চে, কিন্তু সেও তা’র ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ।

তোমরা যখন ছুটি পাবে, আমরা তখন বোম্বাই অভিমুখে রেলপথে ছুট্‌চি। কিন্তু সে-পথ মোগলসরাই দিয়ে যায় না, সে হ’চ্চে বেঙ্গল নাগপুর লাইন। তা’রপরে বোম্বাই হ’য়ে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ হ’য়ে মালাবার, মালাবার হ’য়ে সিংহল, সিংহল হ’য়ে পুনশ্চ বোম্বাই। এমনি বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খেতে খেতে অবশেষে একদিন নভেম্বর মাসের কোন্ তারিখে শান্তিনিকেতনে এসে একখানা লম্বা কেদারার উপর চিৎ হ’য়ে প’ড়্‌বো। তা’রপরেই আবার সুরু হবে সাতই পৌষের পালা। তা’রপরে আরো কত কী আছে তা’র ঠিক নেই। ছুটির নাটক লিখ্‌লেই কি ছুটি পাওয়া যায়? আমি ইস্কুল পালিয়েও ছুটি পেলুম না, ইস্কুলের আবর্ত্তের মধ্যে লাটিমের মতো ঘুর্‌তে লাগ্‌লুম। অঙ্ক ক’ষতে ঢিলেমি ক’র্‌লুম, আজ চাঁদার অঙ্কের ধ্যান ক’র্‌তে ক’র্‌তে আহার নিদ্রা বন্ধ। ইংরেজি প্রবাদে এই রকম ব্যাপারকেই ব’লে থাকে ভাগ্যের বিদ্রূপ।

এতদিন পরে আমাদের এখানে রৌদ্রোজ্জ্বল চেহারা দেখা দিয়েচে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হ'চ্চে কিন্তু সে শরতের ক্ষণিক বৃষ্টি। দিন সুন্দর, রাত্রি নির্ম্মল, মেঘ রঙিন, বাতাস শিশির-স্নিগ্ধ। এ হেন কালে অতলস্পর্শ অকর্ম্মণ্যতার মধ্যে ডুবে থাকাই ছিল বিধির বিধি, কিন্তু ভাগ্যের লিখন বিধির বিধিকেও অতিক্রম করে, এই কথা স্মরণ ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এই পত্র সমাপন করি। ইতি, ২৪ ভাদ্র, ১৩২৯।

৫৩

শান্তিনিকেতন

ইতিমধ্যে আমার দৈনিক কার্য্যকলাপের একটু-খানি scene ব'দলে গেচে। সেই বড়ো ঘরটা ছেড়ে দিয়েচি, সেটা রাস্তার ধারে থাকাতে যখন-তখন যে-সে এসে উৎপাত ক'র্‌তো। এখন এসেচি দক্ষিণের বারান্দার পূর্ব্ব কোণে, না'বার ঘরটার ঠিক বিপরীত প্রান্তে, একটি ছোটো ঘরে। এ ঘরটার গোড়াপত্তন তুমি বোধ হয় দেখেছিলে। আমার সেই কালো শ্লেট-বাঁধানো লেখ্‌বার টেবিলে ঘরের প্রায় সমস্ত

জায়গা জুড়ে গিয়েচে, কেবল আর-একটিমাত্র চৌকি আছে। ঘরের মধ্যে লোকের ভিড় হবার জায়গা রাখিনি।

এখন মধ্যাহ্ন, ক-টা বেজেচে ঠিক ব'ল্‌তে পারিনে, কারণ আমার ঘড়ি বন্ধ। বন্ধ না থাক্‌লেও-যে ঠিক সময় পাওয়া যেতো তা নয়; তুমি আমার সেই ঘড়ির পরিচয় জানো। এইটুকু ব'ল্‌তে পারি, কিছু পূর্ব্বেই একখানা পরোটা ডাল ও তরকারী সংযোগে আহার ক'রে লিখ্‌তে ব'সেচি।

রৌদ্র প্রখর, শরতের শাদা মেঘ স্তরে স্তরে আকাশের যেখানে-সেখানে স্ফীত হ'য়ে প'ড়ে আছে, বাইরে থেকে শালিখ পাখীর ডাক শুনতে পাচ্চি, বামের রাস্তা দিয়ে কঁ্যাচ কঁ্যাচ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মন্দগমনে গোরুর গাড়ি চ'লেচে, আমার ডানদিকের দক্ষিণের জানালা দিয়ে কচি ধানের ক্ষেতের প্রান্তে সুদূর তালগাছের সার দেখা যাচ্চে, তন্দ্রালস ধরণীর দীর্ঘনিশ্বাসটি নিয়ে আতপ্ত হাওয়া ধীরে ধীরে আমার পিঠে এসে লাগ্‌চে।

এ রকম দিনে কাজ ক'র্‌তে ইচ্ছে করে না, এই মেঘগুলোর মতোই অকেজো হাওয়ায় মনটা বিনা

কারণে দিগন্ত পার হ'য়ে ভেসে যেতে চায়। জানলার বাইরে মাঝে মাঝে যখন চোখ ফেরাই তখন মনে হয় যেন সুর-বালকেরা স্বর্গের পাঠশালা থেকে গুরুমহাশয়কে না ব'লে পালিয়ে এসেচে। আকাশের এ-কোণ ও-কোণ থেকে সবুজ পৃথিবীর দিকে তা'রা উঁকি মারচে। হাওয়ায় হাওয়ায় তাদের কানাকানি শুনে আমার মনটাও উতলা হ'য়ে দৌড় মারবার চেষ্টা ক'রচে।

কিন্তু আমরা-যে পৃথিবীর ভারাকর্ষণের টানে বাঁধা; মাটি আমাদের পা জড়িয়ে থাকে, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। অতএব মনের একটা ভাগ জানালার বাইরে দিয়ে যতই উড়তে থাক্, আর-একটা ভাগ ডেস্কের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে পত্ররচনায় ব্যস্ত। দূরে কোথাও যদি যাবার ব্যবস্থা হয়, মনটাকে রেলভাড়ার কথা ভাবতে হয়; দেবতার মতো শরতের মেঘের উপর চ'ড়ে মালতী-সুগন্ধী হাওয়ার হিল্লোলে বেণুবনের পাতায় পাতায় দোল খেয়ে খেয়ে বিনা ব্যয়ে ভ্রমণ ক'রে বেড়াতে পারে না। ইতি, ৩১ ভাদ্র, ১৩৩০।

৫৪

মাদ্রাজ

এইমাত্র মাদ্রাজে এসে পৌঁচেচি। আজ রাত্রে কলম্বো রওয়ানা হবো। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও নানা ঘূর্ণিপাকের আঘাতে দেহ মন ভেঙে ছিঁড়ে বেঁকে চুরে গিয়েছিলো, ক্লান্তি ও অবসাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এসে বেরিয়েছিলুম।

গাড়ি যখন সবুজ প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে চ'লছিলো তখন মনে হ'চ্ছিলো যেন নিজের কাছ থেকে নিজে দৌড়ে ছুটে পালাচ্চি। একদিন আমার বয়স অল্প ছিল; আমি ছিলুম বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মাঝখানে; নীল আকাশ আর শ্যামল পৃথিবী আমার জীবন-পাত্রে প্রতিদিন নানা রঙের অমৃত রস ঢেলে দিত; কল্পলোকের অমরাবতীতে আমি দেবশিশুর মতোই আমার বাঁশী হাতে বিহার ক'র্‌তুম।

সেই শিশু সেই কবি আজ ক্লিষ্ট হ'য়েচে, লোকালয়ের কোলাহলে তা'র মন উদ্‌ভ্রান্ত, তা'রই পথের ধুলায় তা'র চিত্ত ম্লান। সে আপন ক্লান্ত বিক্ষত চরণ নিয়ে তা'র সেই সৌন্দর্য্যের স্বপ্নরাজ্যে

ফিরে যেতে চাচ্চে। তা'র জীবনের মধ্যাহ্নে কাজও সে অনেক ক'রেচে, ভুলও কম করেনি; আজ তা'র কাজ কর্‌বার শক্তি নেই, ভুল কর্‌বার সাহস নেই। আজ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় সে আর-একবার বিশ্ব-প্রকৃতির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আকাশের তারার সঙ্গে সুর মিলিয়ে শেষ বাঁশী বাজিয়ে যেতে চায়। যে-রহস্যলোক থেকে এই মর্ত্ত্যলোকে একদিন সে এসেছিলো সেখানে ফিরে যাবার আগে শান্তি-সরোবরে ডুব দিয়ে স্নান ক'র্‌তে চায়। তেমন ক'রে ডুব দিতে যদি পারে তা হ'লে তা'র জীর্ণতা তা'র ম্লানতা সমস্ত ঘুচে যাবে; আবার তা'র মধ্য থেকে সেই চিরশিশু বাহির হ'য়ে আস্‌বে।

সংসারের জটিলতায় ঘিরে ঘিরে আমাদের চিত্তের উপর যে জীর্ণতার আবরণ সৃষ্টি করে সেটা তো ধ্রুব সত্য নয়, সেটা মায়া। সেটা যে-মুহূর্ত্তে কুহেলিকার মতো মিলিয়ে যায় অমনি নবীন নির্ম্মল প্রাণ আপনাকে ফিরে পায়। এমনি ক'রে বারে বারে আমরা নূতন জীবনে নূতন শিশুর রূপ ধরি। সেই নূতন জীবনের সরল বাল্যমাধুর্য্যের জন্যে আমার সমস্ত মন আগ্রহে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেচে।

আজ আমি চ'লেচি সমুদ্র পারে কাজের ক্ষেত্রে; যখন সেই কাজের ভিড়ে থাক্‌বো তখন হয় তো আমার ভিতরকার কর্ম্মী আর-সকল কথা ভুলিয়ে দেবে। কিন্তু তবু সেই সুদূর গানের ঝরণাতলায় বাঁশীর বেদনা ভিতরে ভিতরে আমাকে নিশ্চয়ই ডাক্‌বে;—ডাক্‌বে সেই নির্জ্জন নির্ম্মল নিভৃত ঝরণাতলার দিকেই। সেই ডাক আমার সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদের ভিতর দিয়ে আমার বুকের মধ্যে আজ এসে কুহরিত হ'চ্চে। ব'ল্‌চে, সেখানে ফিরে যাবার পথ এখনো সম্পূর্ণ হয় নি, এখনো আমার সুরের পাথেয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হ'য়ে যায় নি, এখনো সেই নব নব বিস্ময়ে দিশাহারা বালককে কোনো এক ভিতরমহলে খুঁজে পাওয়া যায়।

তাই, যদিও আজ চ'লেচি পশ্চিম-সমুদ্রের তীরে, আমার মন খুঁজে বেড়াচ্চে আর-এক তীরে সকল-কাজভোলা সেই বালকটাকে। পূরবী গানে সে আপন লীলা শেষ ক'র্‌তে না পার্‌লে সন্ধ্যা ব্যর্থ হবে; এখন সে কোথায় ঘুরে ম'র্‌চে। ফিরে আয়, ফিরে আয়, ব'লে ডাক প'ড়েচে। একজন কে তা'র গান শুনতে ভালোবাসে। আকাশের মাঝখানে

তা'র আসন পাতা, সেই তো শিশুকালে তাকে বাঁশীর দীক্ষা দিয়েছিলো, নিশীথরাতের শেষ রাগিণী বাজানো হ'লে তা'রপরে তা'র বাঁশী ফিরে নেবে। আজ কেবলি সেই কথাই আমার মনে প'ড়্‌চে। ইতি, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪।

৫৫

কলিকাতা

আজ সন্ধ্যাবেলায় ঘন মেঘ ক'রে খুব একচোট বৃষ্টি হ'য়ে গেচে। এখন বৃষ্টি নেই কিন্তু আকাশে মেঘ কালো হ'য়ে জ'মে আছে। প্রশান্ত আর রাণী কোথায় চ'লে গেচে—বাড়িতে কেউ কোথাও নেই—আমি টেবিলের উপর ইলেক্‌ট্রিক্ আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে ব'সেচি। সমস্ত দিন নানা কাজে, নানা লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে, নানা লেখায় কেটে গিয়েচে। এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম ক'র্‌তে পাইনি—লেখার মাঝে মাঝে খুব ঘুম পেয়েছিলো, কিন্তু ক'ষে ঝাঁকানি দিয়ে ঘুম তাড়িয়ে কাজ ক'রে গেচি। নিজেকে একরকম ক'রে খুঁচিয়ে কাজ করানো

একেবারেই ভালো নয় জানি। তাতে কাজও-যে ভালো হয় তা নয় আর বিশ্রামও মাটি হ'য়ে যায়। কিন্তু আমার কুষ্ঠিতে কর্ম্ম-স্থানে শনি আছে, সে আমাকে দয়ামায়া একটুও করে না—ক'ষে খাটিয়ে নেয়, মজুরিও যথেষ্ট দেয় না। কাল দিনেরবেলায় আবার নানারকম কাজের পালা আরম্ভ হবে—তাই এখন চিঠি লিখ্‌তে ব'সেচি। এখন সন্ধ্যে সাড়ে আটটা —তোমার ওখানে হয় তো তুমি এখন পড়ার বই নিয়ে ব'সে গেচো। আজকাল আমাকে যে-রকম দায়ে প'ড়ে খাট্‌তে হয়, যদি তোমাদের বয়সে সেইরকম পরীক্ষার পড়ায় খাট্‌তুম তা হ'লে এতদিনে হয় তো আই, এ, পরীক্ষা পাসের তক্‌মা প'রে কন্যাকর্ত্তাদের মহলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পার্‌তুম। তা হ'লে পণের টাকায় বিশ্বভারতীর ঝুলি ভর্ত্তি ক'রে দিনে-দুপুরে নাকে তেল দিয়ে নিদ্রা দিতে একটুও দ্বিধা বোধ হ'তো না। আমার ক'ল্‌কাতার কাজ শেষ হ'য়ে এলো, পরশু কিম্বা শনিবার শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবো, সেখানে এতদিনে শরৎকালের রোদ্দুরে আকাশে সোনার রং ধ'রেচে আর শিউলি ফুলের গন্ধে বাতাস ভোর হ'য়ে আছে। আজ বুধবার; আজ থেকে

ছেলেরা সব হো হো ক'র্তে ক'র্তে বাড়িমুখো দৌড়েচে—কাল পর্শুর মধ্যে আশ্রম প্রায় শূন্য হ'য়ে যাবে। এদিকে শুক্লপক্ষ এসে প'ড়্লো, দিনে দিনে সন্ধ্যার পেয়ালাটি চাঁদের আলোয় ভর্ত্তি হ'য়ে উঠ্তে থাক্বে। আমি বারান্দায় আরাম কেদারার উপর পা তুলে দিয়ে একলা চুপ ক'রে ব'স্বো—চাঁদ আমার মনের ভাবনাগুলির 'পরে আপন রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে তাদের স্বপ্নময় ক'রে তুল্বে,—ছাতিমতলায় ঝ'রে-পড়া মালতী ফুলের গন্ধ জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশে যাবে। সেই সুগন্ধি শুক্লরাত আমার মনের একোণ-ওকোণে উঁকি দিয়ে কোনো নতুন গানের সুর খুঁজে বেড়াবে—বেহাগ কিম্বা সিন্ধু কিম্বা কানাড়া। থাক্—সে-সব কথা পরে হবে, আপাততঃ চিঠি বন্ধ ক'রে এখানকার বারান্দায় মেঘাবৃত রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম ক'র্তে যাই। যদি ক্লান্তির ঘুমে চোখ বুজে আসে তা হ'লে তাকে তাড়া দিয়ে দেশছাড়া ক'রবো না।

৫৬

বোম্বাই

তুমি লিখেচো, তোমার সব কথার জবাব দিতে; অতএব তোমার চিঠি সাম্‌নে রেখে জবাব দিতে ব'সেচি—এবারে বোধ হয় পুরো মার্ক পাবো। তোমার প্রথম প্রশ্ন—আমি এখন কোথায় আছি। ছিলুম নানা জায়গায়, প্রধানতঃ কাঠিয়াবাড়ে, তা'রপরে আমেদা-বাদে, তা'রপরে বরোদায়, আজ সকালে এসেচি বোম্বাইয়ে। এতকাল ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম ব'লে সমস্ত চিঠি এখানে জমা হ'চ্ছিলো, তা'র মধ্যে তোমার দু-খানা চিঠি। লেফাফার সর্ব্বাঙ্গে নানাপ্রদেশের নানা ডাকঘরের কালো কালো চাকা চাকা ছাপ। এখানে বেশিদিন থাকা হবে ব'লে বোধ হ'চ্চে না, কারণ ৭ই পৌষ নিকটবর্ত্তী। অতএব দু-চার দিনের মধ্যে সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং বঙ্গভূমিকে প্রণাম ক'র্‌তে যাত্রা ক'র্‌বো। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েচি, যাই হোক্, খৃষ্টমাসের পূর্ব্বেই ফির্‌বো। তোমার বাবাকে লিখে দিয়েচি, তোমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে

আস্‌তে। এই পর্য্যন্ত তোমায় উত্তর দিয়ে তোমার চিঠি খুঁজে দেখ্‌লুম, আর কোনো প্রশ্ন নেই।

এল্‌ম্‌হার্ষ্ট্‌ আমার সঙ্গে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে বরোদায় এসে জ্বরে প'ড়েছিলো। সেখানে তিন দিন বিছানায় প'ড়েছিলো, এখানে এসে সেরে উঠেচে। আর আমার সঙ্গে আছে গোরা। এবারে সাধুচরণের সঙ্গ ও সেবা থেকে বঞ্চিত আছি। বনমালী নামধারী উৎকলবাসী সেবক বৌমার আদেশক্রমে এসেচে। সে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে আছে। সবচেয়ে ভয় আমাকে, অথচ আমি বিশেষ ভয়ঙ্কর নই। দ্বিতীয় ভয়, পাছে রাজবাড়ির অন্নপানে বিদেশে গঙ্গাতীর হ'তে দূরবর্ত্তী দেশে অকালমৃত্যু ঘটে। তৃতীয় ভয়, রেলগাড়িতে বিদেশীয় জনতাকে,—তা'রা ওর সঙ্গে হিন্দী বলে, ও বলে বাংলা—তাতে কথোপকথন উভয় পক্ষেই দুর্ব্বোধ হ'য়ে ওঠে। ওর বিশ্বাস, এ জন্য বিদেশীরাই দায়িক। ওর আর-একটা বিশেষ গুণ এই-যে, ওকে যদি কোনো কাপড় বের ক'রে দিতে বলি তা হ'লে সিন্দুক থেকে একে একে সব কাপড় বের ক'রে তবে সেটা নির্ব্বাচন ক'র্‌তে পারে, আবার সবগুলো তাকে একে একে ফিরে গোচাতে হয়। মানুষের আয়ু যখন অল্প, সময় যখন

সীমাবদ্ধ, তখন এরকম চাকর নিয়ে মর্ত্ত্যলোকে অসুবিধায় প'ড়্‌তে হয়। ওর একটা মস্ত গুণ এই-যে, ও ঠাট্টা ক'র্‌লে বুঝ্‌তে পারে, ঠিক সময়ে হাস্‌তে জানে; আমার late lamented সাধুচরণের সে-বালাই ছিল না। আমার আবার স্বভাব এমন-যে, ঠাট্টা না ক'রে বাঁচিনে, তাই ও যতক্ষণ কাপড় বের ক'র্‌চে আর গোচাচ্চে, আমি ততক্ষণ সেই সুদীর্ঘ সময় ঠাট্টা ক'রে অতিবাহন করি। যাই হোক্‌, ওকে বিদেশী হাওয়া, বিদেশী খাওয়া, বিদেশী ভিড় থেকে ফিরে নিয়ে গিয়ে কোনোমতে বৌমার হাতে আস্তটি ফিরে দিতে পার্‌লে নিরুদ্বিগ্ন হই। আমার-যে কতবড়ো দায়িত্ব, সে ওকে না দেখ্‌লে ভালো ক'রে অনুধাবন ক'র্‌তেই পার্‌বে না। একে আমার বিশ্বভারতী, তার উপর বনমালী। ভাবনার আর অন্ত নাই।

আমি বোধহয় দুই তিন দিনের মধ্যেই রওনা হবো, অতএব যদি চিঠি লেখো তো শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় লিখো। ইতি, বোধ হ'চ্চে ১০ই ডিসেম্বর।

৫৭

জাহাজ প্রায় ন-টার সময় ছাড়্লো। সেই আমাদের পুরোনো গঙ্গাতীর—এই তীর ছেলেবেলায় আমাকে কতদিন কী গভীর আনন্দ দিয়েচে। ধীরে ধীরে যখন সেই শান্ত সুন্দর নিভৃত শ্যামল শোভা দেখি আর এই উদার গঙ্গার কলধ্বনি শুনি তখন আমার সমস্ত মন একে আঁক্ড়ে ধরে ;—ছোটো শিশু যেমন ক'রে মাকে ধরে। আমি জীবনের কতকাল-যে এই নদীর বাণী থেকেই আমার বাণী পেয়েচি, মনে হয় সে যেন আমি আমার আগামী জন্মেও ভুল্‌বো না : বস্তুতঃ এই জীবনেই আমার সেই জন্ম কেটে গিয়েচে।

ছেলেবেলায় যখন সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে এই জলস্থল আকাশের মহাপ্রাঙ্গণে আমার খেলা আরম্ভ ক'রেছিলুম, সেই খেলার দিন আজ ফুরিয়ে গেচে। আজ এই বিপুল বিচিত্র মাতৃ-অঙ্গন থেকে বহুদূরে এসেচি। সকালবেলাকার ফুলের সব শিশির শুকিয়ে গেচে—আজ প্রখর মধ্যাহ্নের কর্ত্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রচি। আমার কর্ম্মের সঙ্গে পাখীর গান, নদীর

কল্লোল, পাতার মর্ম্মর আপনার সুর যোগ ক'রে দিতে পারচে না—অন্যমনস্ক হ'য়ে আছি। নীলাকাশের অনিমেষ দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে এসে তেমন অবারিত আত্মীয়তায় মিল্‌চে না, কর্ম্মশালার জানলা-দরজার ফাঁক দিয়ে এই বিশ্বের হৃদয় আগেকার মতো তেমন সম্পূর্ণ ক'রে আমার বুকের উপর এসে পড়ে না, মাঝখানে কত রকমের চিন্তার, কত রকমের চেষ্টার ব্যবধান। এই তো দেখ্‌চি সেদিনকার লীলা-লোক থেকে আজকের দিনের কর্ম্মলোকে জন্মান্তর গ্রহণ ক'রেচি, তবু সেদিনকার ভোরবেলায় সানাইয়ের সুরে ভৈরবী আলাপ এখনো ক্ষণে ক্ষণে মনে প'ড়ে মনকে উতলা ক'রে দেয়!

কাল গঙ্গার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলুম। তখন কেবলি জলের থেকে আকাশ থেকে তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি থেকে এই প্রশ্ন আমার কানে আস্‌ছিলো, "মনে পড়ে কি?" এবারকার এই দেহের ক্ষেত্র থেকে যখন বেরিয়ে চ'লে যাবো, তখনো কি এই প্রশ্ন ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদয়ের উপর হাওয়ায় ভেসে আস্‌বে? এবারকার এই জীবনের এই ধরণীর সমস্ত "জন্মান্তর-সৌহৃদানি"!

কাল দোল-পূর্ণিমা গঙ্গার উপরেই দেখা দিল। জাহাজ বালির চরে জোয়ারের অপেক্ষায় রাত্রি সাতটা পর্য্যন্ত আট্‌কে প'ড়েছিলো। সমুদ্রে যদি দোল-পূর্ণিমার আবির্ভাব হ'তো তা হ'লেই তা'র নাম সার্থক হ'তো— তা হ'লে দোলনও থাক্‌তো, আর নীলের সঙ্গে শুভ্রের, সাগরের সঙ্গে জ্যোৎস্নার মিলনও দেখ্‌তুম।

আজ ভোরে উঠে দেখ্‌লুম, জাহাজ কূলরেখাহীন জলরাশির উপরে ভেসে চ'লেচে—"মধুর বহিছে বায়ু।" আজ শনিবার; সোমবারে শুন্‌চি রেঙ্গুনে পৌঁচবো। সেখানে দিন-দুয়েক সভাসমিতি, অভ্যর্থনা, মাল্যচন্দন, বক্তৃতা, জনতার করতালিতে আমাকে চেপে মার্‌বার চেষ্টা। তা'রপরে বোধ হয় বুধবারে কোনো এক সময়ে মুক্তি। ইতি, চৈত্র ১৩৩০।

৫৮

কলম্বো

ভারতবর্ষ ছেড়ে এই খানিকক্ষণ হ'লো সিংহলে এসেচি। কাল সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়্‌বে। আকাশ অন্ধকার। ঘন বাদলার মেঘ সকালবেলার

সোনার আলো গণ্ডুষ ভ'রে পান ক'রেচে, কেবল তা'র তলানি ছায়াটুকু বাকি। দেশে থাক্‌লে সকালবেলায় দিনের এই ছায়াবগুণ্ঠন ভালোই লাগ্‌তো। ইচ্ছে ক'র্‌তো, কাজকর্ম্ম বন্ধ ক'রে মাঠের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নরাজ্যে মনটাকে পথহারা ক'রে ছেড়ে দিই, কিম্বা হয় তো গুন-গুন সুরে নতুন একটা গান ধ'রে মেঘদূতের কবির সঙ্গে যথাসাধ্য পাল্লা দিতে ব'স্‌তুম।

কিন্তু এখানে মনটা বিরাগী, তা'র একতারাটা কোথায় হারিয়ে গেচে। "গানহারা মোর হৃদয়তলে" এই অন্ধকার যেন একটা স্তূপাকার মূর্চ্ছার মতো উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছে। সুদূর এবং সুদীর্ঘ যাত্রার দিনের মুখে আকাশ থেকে সূর্য্যের আলো দেবতার অভিনন্দ-নের মতো বোধ হয়। আজ মনে হ'চ্চে যেন আমার সেই জয়যাত্রার অধিদেবতা নীরব। গগন-বীণার থেকে যে-বাণী পাথেয় স্বরূপ সংগ্রহ ক'রে সমুদ্রে পাড়ি দিতুম, সেই আকাশভরা বাণী আজ কোথায়?

কালস্রোতে যে-বাড়িতে এসে আছি, এ একজন লক্ষপতির বাড়ি। প্রকাণ্ড প্রাসাদ। আরামে বাস কর্‌বার পক্ষে অত্যন্ত বেশি ঢিলে, ঘরগুলোর প্রকাণ্ড হাঁ মানুষকে গিলে ফেলে। যে-ঘরে ব'সে আছি,

তা'র জিনিসগুলো এত বেশি ফিটফাট-যে, মনে হয় সেগুলো ব্যবহার কর্‌বার জন্যে নয়, সাজিয়ে রাখ্‌বার জন্যে। বস্‌বার শোবার আসবাবগুলো শুচিবায়ুগ্রস্ত গৃহিণীর মতো; সন্তর্পণে থাকে, কাছে গেলে যেন মনে মনে স'রে যায়। এই ধনী-ঘরের অতিপারিপাট্য এও যেন একটা আবরণের মতো।

আমার সেই তেতালা ঘরের চেহারা মনে পড়ে তো? সমস্ত এলোমেলো। সেখানে শোবার বস্‌বার জন্যে একটুও সাবধান হবার দরকার হয় না;—তা'র অপরিচ্ছন্নতাই যেন তা'র প্রসারিত বাহু, তা'র অভ্যর্থনা। সে-ঘর ছোটো, কিন্তু সেখানে সবাইকেই ধরে। মানুষকে ঠিক মতো ধর্‌বার পক্ষে হয় ছোট্ট একটি কোণ, নয় অসীম বিস্তৃত আকাশ। ছেলেবেলায় যখন আমি পদ্মার কোলে বাস ক'র্‌তুম, তখন পাশা-পাশি আমার দুই রকম বাসাই ছিল। একদিকে ছিল আমার নৌকোর ছোটো ঘরটি, আর-একদিকে ছিল দিগন্তপ্রসারিত বালুর চর। ঘরের মধ্যে আমার অন্তরাত্মার নিশ্বাস, আর চরের মধ্যে তা'র প্রশ্বাস। একদিকে তা'র অন্দরের দরজা, আর একদিকে তা'র সদর দরজা।

৫৯

শান্তিনিকেতন

পৃথিবীতে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জ্ঞানীলোকেরা এই গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রেচেন-যে, রাত্রিটা নিদ্রা দেবার জন্যে। নিজেদের এই মত সমর্থন করবার জন্যে তাঁরা স্বয়ং সূর্য্যের দোহাই দেন। তাঁরা আশ্চর্য্য গবেষণা এবং যুক্তি-নৈপুণ্য প্রয়োগ ক'রে ব'লেচেন, রাত্রে নিদ্রাই যদি প্রকৃতির অভিপ্রায় না হবে তবে রাত্রে অন্ধকার হয় কেন, অন্ধকারে দর্শন মনন শক্তির হ্রাস হয় কেন, উক্ত শক্তির হ্রাস হ'লে কেনই বা আমাদের দেহ তন্দ্রালস হ'য়ে আসে?

গভীর অভিজ্ঞতা-প্রসূত এই সকল অকাট্য যুক্তির কোনো উত্তর দেওয়া যায় না, কাজেই পরাস্ত হ'য়ে ঘুমোতে হয়। তাঁরা সব শাস্ত্র ও তা'র সব ভাষ্য ঘেঁটে ব'লেচেন-যে, রাত্রে ঘুম না হওয়াকেই বলে অনিদ্রা, ঘুম হ'লে অনিদ্রা ব'লে জগতে কোনো পদার্থ থাক্‌তোই না। এতবড়ো কথার সমস্ত তাৎপর্য্য বুঝ্‌তেই পারি না, আমাদের তো দিব্যদৃষ্টি নেই, আমরা যথোচিত পরিমাণে ধ্যান-ধারণা-নিদিধ্যাসন করিনি, সেই জন্যে

সংশয়-কলুষিত চিত্তে আমরা তর্ক ক'রে থাকি-যে, রাত্রে কয়েক ঘণ্টা না ঘুমোলেই সেটাকে লোকে অনিদ্রা ব'লে নিন্দা করে, অথচ দিনে অন্ততঃ বারো ঘণ্টাই-যে কেউ ঘুমোইনে সেটাকে ডাক্তারীশাস্ত্রে বা কোনো শাস্ত্রেই তো অনিদ্রা বলে না। শুনে প্রবীণ লোকেরা আমাদের অর্ব্বাচীন ব'লে হাস্য করেন; বলেন আজকালকার ছেলেরা দু-চার পাতা ইংরেজি প'ড়ে তর্ক ক'র্‌তে আসে, জানে না-যে, "বিশ্বাসে মিলয়ে নিদ্রা, তর্কে বহু দূর।"

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ বারবার পরীক্ষা ক'রে দেখা গেচে-যে, তর্ক যতই ক'র্‌তে থাকি নিদ্রা ততই চ'ড়ে যায়, বিনা তর্কে তা'র হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়। অতএব আজকের মতো চিঠি বন্ধ ক'রে শুতে যাই। যদি সম্ভবপর হয় তা হ'লে কাল সকালে চিঠি লিখ্‌বো।

চিঠি বন্ধ করা যাক্, কেরোসিন প্রদীপটা নিবিয়ে দেওয়া যাক্, ঝপ্ ক'রে বিছানাটার মধ্যে গিয়ে পড়া যাক্। শীত,—বেশ একটু রীতিমতো শীত,—উত্তর-পশ্চিমের দিক থেকে হিমের হাওয়া বইচে। দেহটা ব'লে উঠ্‌চে, "ওহে কবি, আর বাড়াবাড়ি ভালো নয়, তোমার বাজে কথার কারবার বন্ধ ক'রে মোটা কম্বলটা

মুড়ি দিয়ে একবার চক্ষু বোজো, অনন্যগতি আমি তোমার আজন্মকালের অনুগত, আর আমরণ কালের সহচর, তাই ব'লেই কি আমাকে এত দুঃখ দিতে হবে? দেখ্‌চো না, পা দুটো কী রকম ঠাণ্ডা হ'য়ে এসেচে, আর মাথাটা হ'য়েচে গরম? বুঝ্‌চো না কি, এটা তোমার রাত্রিকালের উপযোগী মন্দাক্রান্তা ছন্দের যতি-ভঙ্গের লক্ষণ,—এ সময়ে মস্তিষ্কের মধ্যে শার্দ্দূলবিক্রীড়িতের অবতারণা করা কি প্রকৃতিস্থ লোকের কর্ম্ম?"—কায়ার এই অভিযোগ শুনে তা'র প্রতি অনুরক্ত আমার মন ব'লে উঠ্‌চে, "ঠিক্ ঠিক্! একটুও অত্যুক্তি নেই।" ক্লান্ত দেহ এবং উদ্‌ভ্রান্ত মন উভয়ের সম্মিলিত এই বেদনাপূর্ণ আবেদনকে আর উপেক্ষা ক'র্‌তে পারিনে, অতএব চ'ল্‌লুম শুতে।

প্রভাত হ'য়েচে। তুমি আমাকে বড়ো চিঠি লিখ্‌তে অনুরোধ ক'রেচো। সে-অনুরোধ পালন করা আমার সহজ-স্বভাব-সঙ্গত নয়, পল্লবিত ক'রে পত্র লেখার উৎসাহ আমার একটুও নেই। আমি কখনো মহাকাব্য লিখিনি ব'লে আমার স্বদেশী অনেক পাঠক আমাকে অবজ্ঞা ক'রে থাকেন,—মহাচিঠিও আমি সচরাচর লিখ্‌তে পারিনে। কিন্তু যেহেতু আমার চীনপ্রয়াণের

সময় নিকটবর্ত্তী, এবং তখন আমার চিঠি অগত্যা যথেষ্ট বিরল হ'য়ে আস্‌বে, সেই জন্যে আগামী অভাব পূরণ কর্‌বার উদ্দেশ্যে বড়ো চিঠি লিখ্‌চি। সে-অভাব যে অত্যন্ত গুরুতর অভাব এবং সেটা পূরণ কর্‌বার আর কোনো উপায় নেই, এটা কল্পনা ক'র্‌চি নিছক অহঙ্কারের জোরে। আসল কথাটা এই-যে, এবার তুমি যে চিঠিটা লিখেচো সেটা তোমার সাধারণ চিঠির আদর্শ অনুসারে কিছু বড়ো, সেই জন্যে তোমার সঙ্গে পাল্লা দেবার গর্ব্বে বড়ো চিঠি লিখ্‌চি। তুমি নামতায় আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, লজিকেও তোমার সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করা আমার কর্ম্ম নয়, কিন্তু বাগ্‌বিস্তার বিদ্যায় কিছুতেই আমাকে পেরে উঠ্‌বে না। এই একটি মাত্র জায়গায় যেখানে আমার জিৎ আছে, সেইখানে তোমার অহঙ্কার খর্ব্ব কর্‌বার ইচ্ছা আমার মনে এলো। ইতি ৫ই ফাল্গুন, ১৩৩০।

---